ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত

প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ ১৩৬২

পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৬৮ : ১৮৮৩ শক

লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত

বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা-৯

২'১

সূচীপত্র

ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি বা যায় কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে— পাঠান মোগল পর্তুগিজ ফরাসী ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়, এ-সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।

তখনকার দুর্দিনেও এই কাটাকাটি খুনাখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার, তাহা নহে। ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জন সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না। সেদিনও সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধূলিজালই তাহার চক্ষে আর-সমস্তই গ্রাস করে; কারণ, সে ঘরের ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে। সেইজন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা, ঝড়ের কথাই

পাই ; ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিল না, কেবল মোগল-পাঠানের গর্জনমুখর বাত্যাবর্ত শুষ্ক পত্রের ধ্বজা তুলিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম হইতে পূর্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কিন্তু বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনো ছিল, নহিলে এই-সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর নানক চৈতন্য তুকারাম ইহাদিগকে জন্ম দিল কে ? তখন যে কেবল দিল্লি এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

কিন্তু বর্তমান পাঠ্যগ্রন্থের বহির্ভূত সেই ভারতবর্ষের সঙ্গেই আমাদের যোগ। সেই যোগের বহুবর্ষকালব্যাপী ঐতিহাসিক সূত্র বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমাদের হৃদয় আশ্রয় পায় না। আমরা ভারতবর্ষের আগাছা-পরগাছা নহি, বহু শত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শতসহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে, ঠিক সেই কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভুলিয়া যায়। মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেন কেহই না, আগন্তুকবর্গ ই যেন সব।

নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ এইরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিলে, কোথা হইতে আমরা প্রাণ আকর্ষণ করিব ? এরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না, ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না এবং

এখন আমাদিগকে অশন-বসন আচার-ব্যবহার সমস্তই বিদেশীর কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে।

যে-সকল দেশ ভাগ্যবান্ তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়-সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উলটা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড্ কার্জনের সাম্রাজ্যগর্বোদ্গার -কাল পর্যন্ত যে-কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা, তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাস-শালার দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া উঠে; বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্ত নেত্রের ন্যায় দেখা দেয়। সেই অন্ধকারে আমাদের প্রাচীন দেবমন্দিরসকল মস্তক আবৃত করে, এবং সুলতান-প্রেয়সীদের শ্বেতমর্মররচিত কারুখচিত কবরচূড়া নক্ষত্রলোক চুম্বন করিতে উদ্যত হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝন্ঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মসজিদের ফেনবুদ্বুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোজাপ্রহরী-রক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন, এ-সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী? তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে; সেই পুঁথিখানি কেহ খোলে না, সেই আরব্য উপন্যাসেরই প্রত্যেক ছত্র ছেলেরা

মুখস্থ করিয়া লয়। তাহার পরে প্রলয়রাত্রে এই মোগলসাম্রাজ্য যখন মুমূর্ষু, তখন শ্মশানস্থলে দূরাগত গৃধ্রগণের পরস্পরের মধ্যে যে-সকল চাতুরী প্রবঞ্চনা হানাহানি পড়িয়া গেল তাহাও কি ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত? এবং তাহার পর হইতে পাঁচ পাঁচ বৎসরে বিভক্ত ছক-কাটা শতরঞ্চের মতো ইংরাজশাসন, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ আরো ক্ষুদ্র; বস্তুত শতরঞ্চের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার ঘরগুলি কালোয় সাদায় সমান বিভক্ত নহে, ইহার পনেরো আনাই সাদা। আমরা পেটের অন্নের বিনিময়ে সুশাসন সুবিচার সুশিক্ষা সমস্তই একটি বৃহৎ হোয়াইট্যাওয়ে-লেড্‌ল'র দোকান হইতে কিনিয়া লইতেছি, আর-সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। এই কারখানাটির বিচার হইতে বাণিজ্য পর্যন্ত সমস্তই সু হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কেরানিশালার এক কোণে আমাদের ভারতবর্ষের স্থান অতি যৎসামান্য।

ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রথ্‌চাইল্ডের জীবনী পড়িয়া পাকিয়া গেছে সে খৃস্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে— যাহার এক পয়সার সংগতি ছিল না তাহার আবার জীবনী কিসের? তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফ্‌তর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, 'যেখানে পলিটিক্স্‌ নাই সেখানে আবার হিস্‌ট্রি কিসের', তাঁহারা ধানের খেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল খেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।

যিশুখৃস্টের হিসাবের খাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্য বিষয় সন্ধান করিলে খাতাপত্র সমস্ত নগণ্য হইয়া যায়। তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বলিয়া জানিয়াও অন্য বিশেষ দিক হইতে সে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের সেই নিজের দিক হইতে ভারতবর্ষকে না দেখিয়া আমরা শিশুকাল হইতে তাহাকে খর্ব করিতেছি ও নিজে খর্ব হইতেছি। ইংরাজের ছেলে জানে, তাহার বাপ-পিতামহ অনেক যুদ্ধজয় দেশ-অধিকার ও বাণিজ্য-ব্যবসায় করিয়াছে; সেও নিজেকে রণগৌরব ধনগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়। আমরা জানি, আমাদের পিতামহগণ দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যবিস্তার করেন নাই। এইটে জানাইবার জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাঁহারা কী করিয়াছিলেন জানি না, সুতরাং আমরা কী করিব তাহাও জানি না। সুতরাং পরের নকল করিতে হয়। ইহার জন্য কাহাকে দোষ দিব? ছেলেবেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে যে শিক্ষা পাই তাহাতে প্রতিদিন দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া, ক্রমে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহভাব জন্মে।

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও ক্ষণে ক্ষণে হতবুদ্ধির ন্যায় বলিয়া উঠেন, দেশ তুমি কাহাকে বল, আমাদের দেশের বিশেষ ভাবটা কী, তাহা কোথায় আছে, তাহা কোথায় ছিল! প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ, কথাটা এত সূক্ষ্ম, এত বৃহৎ যে, ইহা কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা বোধগম্য নহে। ইংরাজ বলো, ফরাসী বলো, কোনো দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কী, দেশের মূল মর্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না; তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল

হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে; আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না; তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। এই বিচিত্র উদ্যমসম্পন্ন গুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে সংশয়ী জিজ্ঞাসুর কাছে আমরা সংজ্ঞার দ্বারা দুই-চার কথায় ব্যক্ত করিব কী করিয়া ?

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। যাহারা পরকে একান্ত পর বলিয়া সর্বান্তঃকরণে অনুভব না করে, তাহারা রাষ্ট্রগৌরবলাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি; এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয়

সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে তাহা তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে, বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদা জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া যে নিজ নিজ নির্দিষ্ট অধিকারের দ্বারা সমগ্র সমাজকে বহন করিতেছে তাহা নয়, তাহারা পরস্পরের প্রতিকূল— যাহাতে কোনো পক্ষের বলবৃদ্ধি না হয়, অপর পক্ষের ইহাই প্রাণপণ সতর্ক চেষ্টা। কিন্তু সকলে মিলিয়া যেখানে ঠেলাঠেলি করিতেছে সেখানে বলের সামঞ্জস্য হইতে পারে না; সেখানে কালক্রমে জনসংখ্যা যোগ্যতার অপেক্ষা বড়ো হইয়া উঠে, উদ্যম গুণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে এবং বাণিজ্যের ধনসংহতি গৃহস্থের ধনভাণ্ডারগুলিকে অভিভূত করিয়া ফেলে; এইরূপে সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং এই-সকল বিসদৃশ বিরোধী অঙ্গগুলিকে কোনোমতে জোড়াতাড়া দিয়া রাখিবার জন্য গবর্মেন্ট্ কেবলই আইনের পর আইন সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, বিরোধ যাহার বীজ বিরোধই তাহার শস্য; মাঝখানে যে পরিপুষ্ট পল্লবিত ব্যাপারটিকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই বিরোধ-শস্যেরই প্রাণবান্ বলবান্ বৃক্ষ।

ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত করিয়া, তবে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব। সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার

নহে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের উপায় তাহাদিগকে পৃথক্ অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া। পৃথক্‌কে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলনসাধনের এই রহস্য জানিত। ফরাসীবিদ্রোহ গায়ের জোরে মানবের সমস্ত পার্থক্য রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিবে, এমন স্পর্ধা করিয়াছিল; কিন্তু ফল উল্‌টা হইয়াছে, য়ুরোপে রাজশক্তি প্রজাশক্তি ধনশক্তি জনশক্তি ক্রমেই অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল সকলকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা, কিন্তু তাহার উপায় ছিল স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজকলেবরকে এক এবং বিচিত্র কর্মের উপযোগী করিয়াছিল; নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ-বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই। পরস্পর প্রতিযোগিতার পথেই সমাজের সকল শক্তিকে অহরহ সংগ্রামপরায়ণ করিয়া তুলিয়া ধর্ম কর্ম গৃহ সমস্তকেই আবর্তিত আবিল উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখে নাই। ঐক্যনির্ণয় মিলনসাধন এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তি -লাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল।

বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য যে শক্তি পাইয়াছে সেই শক্তি চর্চা করিবার অবসর ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই পাইয়াছে। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ

করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা, নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়; পশুযুদ্ধভূমিতে পশুদলের মতো ইহাদিগকে পরস্পরের উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। ইহাদিগকে বিহিত নিয়মে বিভক্ত স্বতন্ত্র করিয়া একটি মূলভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূলভাবটি ভারতবর্ষের; য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া, সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়— আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া নিয়ুজিলান্ড্ কেপ্‌কলনিতে তাহার পরিচয় আমরা আজ পর্যন্ত পাইতেছি। ইহার কারণ, তাহার নিজের সমাজের মধ্যে একটি সুবিহিত শৃঙ্খলার ভাব নাই; তাহার নিজেরই ভিন্ন সম্প্রদায়কে সে যথোচিত স্থান দিতে পারে নাই এবং যাহারা সমাজের অঙ্গ তাহাদের অনেকেই সমাজের বোঝার মতো হইয়াছে; এরূপ স্থলে বাহিরের লোককে সে সমাজ নিজের কোন্‌খানে আশ্রয় দিবে? আত্মীয়ই যেখানে উপদ্রব করিতে উদ্যত সেখানে বাহিরের লোককে কেহ স্থান দিতে চায় না। যে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে, সকলের স্বতন্ত্র স্থান ও অধিকার আছে, সেই সমাজেই পরকে আপন করিয়া লওয়া সহজ। হয় পরকে কাটিয়া মারিয়া খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুবিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির

করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। বিদেশী যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে ভারতবর্ষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, নাসা কুঞ্চিত করে নাই। ভারতবর্ষ পুলিন্দ শবর ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। য়ুরোপে রিলিজন বলিয়া যে শব্দ আছে ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব; কারণ ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে— আমাদের বুদ্ধি বিশ্বাস আচরণ, আমাদের ইহকাল পরকাল, সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম। ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিয়া কোনোটাকে পোশাকি এবং কোনোটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই। হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়— বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয় দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের

ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম ; তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে ; তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই ; ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবন-ব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।

পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা— নানা বাধাবিপত্তি দুর্গতিসুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।

ভাদ্র ১৩০৯

সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মধ্যেই একটা নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, নিমেষ ও উন্মেষ, নিদ্রা ও জাগরণের পালা আছে ; একবার ভিতরের দিকে একবার বাহিরের দিকে নামা-উঠার ছন্দ নিয়তই চলিতেছে। থামা এবং চলার অবিরত যোগেই বিশ্বের গতিক্রিয়া সম্পাদিত। বিজ্ঞান বলে, বস্তুমাত্রই সছিদ্র, অর্থাৎ 'আছে' এবং 'নাই' এই দুইয়ের সমষ্টিতেই তাহার অস্তিত্ব। এই আলোক ও অন্ধকার, প্রকাশ ও অপ্রকাশ এমনি ছন্দে ছন্দে যতি রাখিয়া চলিতেছে যে, তাহাতে সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে না, তাহাকে তালে তালে অগ্রসর করিতেছে।

ঘড়ির ফলকটার উপরে মিনিটের কাঁটা ও ঘণ্টার কাঁটার দিকে তাকাইলে মনে হয় তাহা অবাধে একটানা চলিয়াছে কিম্বা চলিতেছেই না। কিন্তু সেকেণ্ডের কাঁটা লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় তাহা টিক্‌টিক্‌ করিয়া লাফ দিয়া দিয়া চলিতেছে। দোলনদণ্ডটা যে একবার বামে থামিয়া দক্ষিণে যায়, আবার দক্ষিণে থামিয়া বামে আসে, তাহা ওই সেকেণ্ডের তালে লয়েই ধরা পড়ে। বিশ্বব্যাপারে আমরা ওই মিনিটের কাঁটা, ঘড়ির কাঁটাটাকেই দেখি, কিন্তু যদি তাহার অণুপরিমাণ কালের সেকেণ্ডের কাঁটাটাকে দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম বিশ্ব নিমেষে নিমেষে থামিতেছে ও চলিতেছে— তাহার একটানা তানের মধ্যে পলকে পলকে লয় পড়িতেছে। সৃষ্টির দ্বন্দ্বদোলকটির এক প্রান্তে 'হাঁ' অন্য প্রান্তে 'না', এক প্রান্তে এক অন্য প্রান্তে দুই, এক প্রান্তে আকর্ষণ অন্য প্রান্তে বিকর্ষণ, এক প্রান্তে কেন্দ্রের অভিমুখী ও অন্য প্রান্তে কেন্দ্রের প্রতিমুখী শক্তি। তর্কশাস্ত্রে এই বিরোধকে মিলাইবার জন্য আমরা কত মতবাদের অসাধ্য ব্যায়ামে প্রবৃত্ত, কিন্তু সৃষ্টিশাস্ত্রে ইহারা সহজেই মিলিত হইয়া বিশ্বরহস্যকে অনির্বচনীয় করিয়া তুলিতেছে।

শক্তি জিনিসটা যদি একলা থাকে তবে সে নিজের একঝোঁকা জোরে কেবল একটা দীর্ঘ লাইন ধরিয়া ভীষণ উদ্ধতবেগে সোজা চলিতে থাকে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না; কিন্তু শক্তিকে জগতে একাধিপত্য দেওয়া হয় নাই বলিয়াই, বরাবর তাহাকে জুড়িতে জোড়া হইয়াছে বলিয়াই, দুইয়ের উলটা টানে বিশ্বের সকল জিনিসই নম্র হইয়া, গোল হইয়া, সুসম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে। সোজা লাইনের সমাপ্তিহীনতা, সোজা লাইনের অতি তীব্র তীক্ষ্ণ কৃশতা বিশ্বপ্রকৃতির নহে; গোল আকারের সুন্দর পরিপুষ্ট পরিসমাপ্তিই বিশ্বের স্বভাবগত। এই এক শক্তির একাগ্র সোজা রেখায় সৃষ্টি হয় না— তাহা কেবল ভেদ করিতে পারে, কিন্তু কোনো-কিছুকেই ধরিতে পারে না, বেড়িতে পারে না, তাহা একেবারে রিক্ত, তাহা প্রলয়েরই রেখা; রুদ্রের প্রলয়পিনাকের মতো তাহাতে কেবল একই সুর, তাহাতে সংগীত নাই; এইজন্য শক্তি একক হইয়া উঠিলেই তাহা বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। দুই শক্তির যোগেই বিশ্বের যত-কিছু ছন্দ। আমাদের এই জগৎকাব্য মিত্রাক্ষর— পদে পদে তাহার জুড়ি-জুড়ি মিল।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই ছন্দটি যত স্পষ্ট এবং বাধাহীন, মানবপ্রকৃতির মধ্যে তেমন নহে। সেখানেও এই সংকোচন ও প্রসারণের তত্ত্বটি আছে — কিন্তু তাহার সামঞ্জস্যটিকে আমরা সহজে রাখিতে পারি না। বিশ্বের গানে তালটি সহজ, মানুষের গানে তালটি বহু সাধনার সামগ্রী। আমরা অনেক সময়ে দ্বন্দ্বের এক প্রান্তে আসিয়া এমনি ঝুঁকিয়া পড়ি যে অন্য প্রান্তে ফিরিতে বিলম্ব হয়; তখন তাল কাটিয়া যায়, প্রাণপণে ত্রুটি সারিয়া লইতে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিতে হয়। এক দিকে আত্ম এক দিকে পর, এক দিকে অর্জন এক দিকে বর্জন, এক দিকে সংযম এক দিকে স্বাধীনতা, এক দিকে

আচার এক দিকে বিচার মানুষকে টানিতেছে; এই দুই টানার তাল বাঁচাইয়া সমে আসিয়া পৌঁছিতে শেখাই মনুষ্যত্বের শিক্ষা; এই তাল-অভ্যাসের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস। ভারতবর্ষে সেই তালের সাধনার ছবিটিকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার সুযোগ আছে।

গ্রীস রোম ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন মহাসভ্যতার গোড়াতেই একটা জাতিসংঘাত আছে। এই জাতিসংঘাতের বেগেই মানুষ পরের ভিতর দিয়া আপনার ভিতরে পুরামাত্রায় জাগিয়া উঠে। এইরূপ সংঘাতেই মানুষ রূঢ়িক হইতে যৌগিক বিকাশ লাভ করে এবং তাহাকেই বলে সভ্যতা।

পর্দা উঠিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাঙ্কেই আমরা আর্য-অনার্যের প্রচণ্ড জাতিসংঘাত দেখিতে পাই। এই সংঘাতের প্রথম প্রবল বেগে অনার্যের প্রতি আর্যের যে বিদ্বেষ জাগিয়াছিল তাহারই ধাক্কায় আর্যেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত হইতে পারিল।

এইরূপ সংহত হইবার অপেক্ষা ছিল। কারণ, ভারতবর্ষে আর্যেরা কালে কালে ও দলে দলে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই গোত্র দেবতা ও মন্ত্র যে একই ছিল তাহা নহে। বাহির হইতে যদি একটা প্রবল আঘাত তাঁহাদিগকে বাধা না দিত তবে এই আর্য-উপনিবেশ দেখিতে দেখিতে নানা শাখা-প্রতিশাখায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। তাহারা আপনাদিগকে এক বলিয়া জানিতে পারিত না। আপনাদের সামান্য বাহ্য ভেদগুলিকেই বড়ো করিয়া দেখিত। পরের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়াই আর্যেরা আপনাকে আপন বলিয়া উপলব্ধি করিলেন।

বিশ্বের সকল পদার্থের মতো সংঘাত পদার্থেরও দুই প্রান্ত আছে—

তাহার এক প্রান্তে বিচ্ছেদ, আর-এক প্রান্তে মিলন। তাই এই সংঘাতের প্রথম অবস্থায় স্ববর্ণের ভেদরক্ষার দিকে আর্যদের যে আত্মসংকোচন জন্মিয়াছিল সেইখানেই ইতিহাস চিরকাল থামিয়া থাকিতে পারে না। বিশ্বছন্দ-তত্ত্বের নিয়মে আত্মপ্রসারণের পথে মিলনের দিকে ইতিহাসকে একদিন ফিরিতে হইয়াছিল।

অনার্যদের সহিত বিরোধের দিনে আর্যসমাজে যাঁহারা বীর ছিলেন, জানি না তাঁহারা কে। তাঁহাদের চরিতকাহিনী ভারতবর্ষের মহাকাব্যে কই তেমন করিয়া তো বর্ণিত হয় নাই। হয়তো জনমেজয়ের সর্পসত্রের কথার মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রাচীন যুদ্ধ-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। পুরুষানুক্রমিক শত্রুতার প্রতিহিংসা -সাধনের জন্য, সর্প-উপাসক অনার্য নাগজাতিকে একেবারে ধ্বংস করিবার জন্য, জনমেজয় নিদারুণ উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন এই পুরাণকথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে বটে; তবু এই রাজা ইতিহাসে তো কোনো বিশেষ গৌরব লাভ করেন নাই।

কিন্তু অনার্যদের সহিত আর্যদের মিলন ঘটাইবার অধ্যবসায়ে যিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তিনি আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

আর্য-অনার্যের যোগবন্ধন তখনকার কালের যে-একটি মহা-উদ্‌যোগের অঙ্গ, রামায়ণ-কাহিনীতে সেই উদ্‌যোগের নেতারূপে আমরা তিনজন ক্ষত্রিয়ের নাম দেখিতে পাই। জনক বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। এই তিন জনের মধ্যে কেবলমাত্র একটা ব্যক্তিগত যোগ নহে, একটা এক অভিপ্রায়ের যোগ দেখা যায়। বুঝিতে পারি রামচন্দ্রের জীবনের কাজে বিশ্বামিত্র দীক্ষাদাতা— এবং বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের সম্মুখে যে লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা তিনি জনক-রাজার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন।

এই জনক বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয়তো বা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের নিকটবর্তী। আকাশের যুগ্মনক্ষত্রগুলিকে কাছে হইতে দেখিতে গেলে মাঝখানকার ব্যবধানে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখায়— তাহারা যে জোড়া তাহা দূর হইতে সহজেই দেখা যায়। জাতীয় ইতিহাসের আকাশেও এইরূপ অনেক জোড়া-নক্ষত্র আছে, কালের ব্যবধানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাদের ঐক্য হারাইয়া যায়— কিন্তু আভ্যন্তরিক যোগের আকর্ষণে তাহারা এক হইয়া মিলিয়াছে। জনক বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের যোগও যদি সেইরূপ কালের যোগ না হইয়া ভাবের যোগ হয় তবে তাহা আশ্চর্য নহে।

এইরূপ ভাবগত ইতিহাসে ব্যক্তি ক্রমে ভাবের স্থান অধিকার করে। ব্রিটিশ পুরাণ-কথায় যেমন রাজা আর্থার। তিনি জাতির মনে ব্যক্তিরূপ ত্যাগ করিয়া ভাবরূপ ধারণ করিয়াছেন। জনক ও বিশ্বামিত্র সেইরূপ আর্য-ইতিহাস-গত একটি বিশেষ ভাবের রূপক হইয়া উঠিয়াছেন। রাজা আর্থার মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ক্ষত্রিয়দের একটি বিশেষ খৃস্টীয় আদর্শ-দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাকেই জয়যুক্ত করিবার জন্য বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত লড়াই করিতেছেন এই যেমন দেখি, তেমনি ভারতে একদিন ক্ষত্রিয়দল ধর্মে এবং আচরণে একটি বিশেষ উচ্চ আদর্শকে উদ্‌ভাবিত করিয়া তুলিয়া বিরোধীদলের সহিত দীর্ঘকাল ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ভারতীয় ইতিহাসে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সংগ্রামে ব্রাহ্মণেরাই যে তাঁহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে।

তখনকার কালের নবক্ষত্রিয়দলের এই ভাবটা কী, তাহার পুরাপুরি সমস্তটা জানা এখন অসম্ভব, কেননা বিপ্লবের জয়পরাজয়ের পরে আবার

যখন সকল পক্ষের মধ্যে একটা রফা হইয়া গেল তখন সমাজের মধ্যে বিরোধের বিষয়গুলি আর পৃথক হইয়া রহিল না এবং ক্ষতচিহ্নগুলি যত শীঘ্র জোড়া লাগিতে পারে তাহারই চেষ্টা চলিতে লাগিল। তখন নূতন দলের আদর্শকে ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিয়া লইয়া পুনরায় আপন স্থান গ্রহণ করিলেন।

তথাপি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আদর্শের প্রভেদ কোন্ পথ দিয়া কী আকারে ঘটিয়াছিল তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। যজ্ঞবিধিগুলি কৌলিকবিদ্যা। এক-এক কুলের আর্যদলের মধ্যে এক-একটি কুলপতিকে আশ্রয় করিয়া বিশেষ বিশেষ স্তবমন্ত্র ও দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার বিধিবিধান রক্ষিত ছিল। যাঁহারা এই-সমস্ত ভালো করিয়া জানিতেন পৌরোহিত্যে তাঁহাদেরই বিশেষ যশ ও ধন -লাভের সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং এই ধর্মকার্য একটা বৃত্তি হইয়া উঠিয়াছিল এবং কৃপণের ধনের মতো ইহা সকলের পক্ষে সুগম ছিল না। এই-সমস্ত মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্র বিধি বিশেষরূপে আয়ত্ত ও তাহা প্রয়োগ করিবার ভার স্বভাবতই একটি বিশেষ শ্রেণীর উপর ছিল। আত্মরক্ষা যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশ-অধিকারে যাঁহাদিগকে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে হইবে তাঁহারা এই কাজের ভার লইতে পারেন না, কারণ, ইহা দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অভ্যাস -সাপেক্ষ। কোনো-এক শ্রেণী এই-সমস্তকে রক্ষা করিবার ভার যদি না লন তবে কৌলিকসূত্র ছিন্ন হইয়া যায় এবং পিতৃপিতামহদের সহিত যোগধারা নষ্ট হইয়া সমাজ শৃঙ্খলাভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই কারণে যখন সমাজের এক শ্রেণী যুদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে নব নব অধ্যবসায়ে নিযুক্ত তখন আর-এক শ্রেণী বংশের প্রাচীন ধর্ম এবং সমস্ত স্মরণীয় ব্যাপারকে বিশুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্যই বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু যখনই বিশেষ শ্রেণীর উপর এইরূপ কাজের ভার পড়ে তখনই সমস্ত জাতির চিত্তবিকাশের সঙ্গে তাহার ধর্মবিকাশের সমতানতায় একটা বাধা পড়িয়া যায়। কারণ, সেই বিশেষ শ্রেণী ধর্মবিধিগুলিকে বাঁধের মতো এক জায়গায় দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখেন, সুতরাং সমস্ত জাতির মনের অগ্রসরগতির সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। ক্রমে ক্রমে অলক্ষ্যভাবে এই সামঞ্জস্য এতদূর পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় যে, অবশেষে একটা বিপ্লব ব্যতীত সমন্বয়সাধনের উপায় পাওয়া যায় না। এইরূপে একদা ব্রাহ্মণেরা যখন আর্যদের চিরাগত প্রথা ও পূজাপদ্ধতিকে আগলাইয়া বসিয়া ছিলেন, যখন সেই-সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে ক্রমশই তাঁহারা কেবল জটিল ও বিস্তারিত করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন ক্ষত্রিয়েরা সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও মানুষিক বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে জয়োল্লাসে অগ্রসর হইয়া চলিতেছিলেন। এইজন্যই তখন আর্যদের মধ্যে প্রধান মিলনের ক্ষেত্র ছিল ক্ষত্রিয়সমাজ। শত্রুর সহিত যুদ্ধে যাহারা এক হইয়া প্রাণ দেয় তাহাদের মতো এমন মিলন আর কাহারও হইতে পারে না। মৃত্যুর সম্মুখে যাহারা একত্র হয় তাহারা পরস্পরের অনৈক্যকে বড়ো করিয়া দেখিতে পারে না। অপর পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে মন্ত্র দেবতা ও যজ্ঞকার্যের স্বাতন্ত্র্য -রক্ষার ব্যবসায় ক্ষত্রিয়ের নহে, তাঁহারা মানবের বন্ধুরদুর্গম জীবনক্ষেত্রে নব নব ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে মানুষ, এই কারণে প্রথামূলক বাহ্যানুষ্ঠানগত ভেদের বোধটা ক্ষত্রিয়ের মনে তেমন সুদৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না। অতএব আত্মরক্ষা ও উপনিবেশবিস্তারের উপলক্ষ্যে সমস্ত আর্যদলের মধ্যকার ঐক্যসূত্রটি ছিল ক্ষত্রিয়দের হাতে। এইরূপে একদিন ক্ষত্রিয়েরাই সমস্ত অনৈক্যের অভ্যন্তরে একই যে সত্যপদার্থ, ইহা অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা হইয়া উঠিয়া ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতিকে অপরাবিদ্যা বলিয়া

ঘোষণা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণকর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, একদিন পুরাতনের সহিত নূতনের বিরোধ বাধিয়াছিল।

সমাজে যখন একটা বড়ো ভাব সংক্রামকরূপে দেখা দেয় তখন তাহা একান্তভাবে কোনো গণ্ডিকে মানে না। আর্যজাতির নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ যতই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল ততই সমাজের সর্বত্রই এই অনুভূতি সঞ্চারিত হইতে লাগিল যে, দেবতারা নামে নানা, কিন্তু সত্যে এক; অতএব বিশেষ দেবতাকে বিশেষ স্তব ও বিশেষ বিধিতে সন্তুষ্ট করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় এই ধারণা সমাজের সর্বত্রই ক্ষয় হইয়া দলভেদে উপাসনাভেদ স্বভাবতই ঘুচিবার চেষ্টা করিল। তথাপি ইহা সত্য যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যা অনুকূল আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং সেইজন্যই ব্রহ্মবিদ্যা রাজবিদ্যা নাম গ্রহণ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই প্রভেদটি সামান্য নহে। ইহা একেবারে বাহিরের দিক ও অন্তরের দিকের ভেদ। বাহিরের দিকে যখন আমরা দৃষ্টি রাখি তখনই আমরা কেবলই বহুকে ও বিচিত্রকে দেখিতে পাই, অন্তরে যখন দেখি তখনই একের দেখা পাওয়া যায়। যখন আমরা বাহ্যশক্তিকেই দেবতা বলিয়া জানিয়াছি তখন মন্ত্রতন্ত্র ও নানা বাহ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগকে বাহির হইতে বিশেষভাবে আপনাদের পক্ষভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইজন্য বাহিরের বহু শক্তিই যখন দেবতা তখন বাহিরের নানা অনুষ্ঠানই আমাদের ধর্মকার্য এবং এই অনুষ্ঠানের প্রভেদ ও তাহারই গূঢ়শক্তি-অনুসারেই ফলের তারতম্য-কল্পনা।

এইরূপে সমাজে যে আদর্শের ভেদ হইয়া গেল, সেই আদর্শভেদের মূর্তিপরিগ্রহ-স্বরূপে আমরা দুই দেবতাকে দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈদিক

মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্যদলের দেবতা বিষ্ণু। ব্রহ্মার চারি মুখ চারি বেদ— তাহা চিরকালের মতো ধ্যানরত স্থির ; আর বিষ্ণুর চারি ক্রিয়াশীল হস্ত কেবলই নব নব ক্ষেত্রে মঙ্গলকে ঘোষিত করিতেছে, ঐক্যচক্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, শাসনকে প্রচারিত করিতেছে এবং সৌন্দর্যকে বিকাশিত করিয়া তুলিতেছে।

দেবতারা যখন বাহিরে থাকেন, যখন মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ অনুভূত না হয়, তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কেবল কামনার সম্বন্ধ ও ভয়ের সম্বন্ধ। তখন তাঁহাদিগকে স্তবে বশ করিয়া আমরা হিরণ্য চাই, গো চাই, আয়ু চাই, শত্রুপরাভব চাই ; যাগযজ্ঞ-অনুষ্ঠানের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে আমাদের অনিষ্ট করিবেন এই আশঙ্কা তখন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। এই কামনা এবং ভয়ের পূজা বাহ্য পূজা, ইহা পরের পূজা। দেবতা যখন অন্তরের ধন হইয়া উঠেন তখনই অন্তরের পূজা আরম্ভ হয়— সেই পূজাই ভক্তির পূজা।

ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে আমরা দুইটি ধারা দেখিতে পাই, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম, অভেদ ও ভেদাভেদ। এই ব্রহ্মবিদ্যা কখনো একের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়াছে, কখনো দুইকে মানিয়া সেই দুইয়ের মধ্যেই একক দেখিয়াছে। দুইকে না মানিলে পূজা হয় না, আবার দুইয়ের মধ্যে এককে না মানিলে ভক্তি হয় না। দ্বৈতবাদী য়িহুদিদের দূরবর্তী দেবতা ভয়ের দেবতা, শাসনের দেবতা, নিয়মের দেবতা। সেই দেবতা নূতন টেস্টামেন্টে যখন মানবের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া আত্মীয়তা স্বীকার করিলেন তখনই তিনি প্রেমের দেবতা, ভক্তির দেবতা হইলেন। বৈদিক দেবতা যখন মানুষ হইতে পৃথক তখন তাঁহার পূজা চলিতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা ও

জীবাত্মা যখন আনন্দের অচিন্ত্যরহস্যলীলায় এক হইয়াও দুই, দুই হইয়াও এক, তখনই সেই অন্তরতম দেবতাকে ভক্তি করা চলে। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেম-ভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়। এই ভক্তিধর্মের দেবতাই বিষ্ণু।

বিপ্লবের অবসানে বৈষ্ণবধর্মকে ব্রাহ্মণেরা আপন করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু গোড়ায় যে তাহা করেন নাই তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনও অবশিষ্ট আছে। বিষ্ণুর বক্ষে ব্রাহ্মণ ভৃগু পদাঘাত করিয়াছিলেন এই কাহিনীর মধ্যে একটি বিরোধের ইতিহাস সংহত হইয়া আছে। এই ভৃগু যজ্ঞকর্তা ও যজ্ঞফলভাগীদের আদর্শরূপে বেদে কথিত আছেন। ভারতবর্ষে পূজার আসনে ব্রহ্মার স্থানকে সংকীর্ণ করিয়া বিষ্ণুই যখন তাহা অধিকার করিলেন—বহুপল্লবিত যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডের যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভক্তিধর্মের যুগ যখন ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইল তখন সেই সন্ধিক্ষণে একটা বড়ো ঝড় আসিয়াছিল। আসিবারই কথা। এই বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার যাহাদের হাতে এবং সেই অধিকার লইয়া যাঁহারা সমাজে একটি বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন তাঁহারা সহজে তাহার বেড়া ভাঙিতে দেন নাই।

এই ভক্তির বৈষ্ণবধর্ম যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রবর্তিত ধর্ম তাহার একটি প্রমাণ, একদা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এই ধর্মের গুরুরূপে দেখিতে পাই—এবং তাঁহার উপদেশের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র ও আচারের বিরুদ্ধে আঘাতেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই, প্রাচীন ভারতের পুরাণে যে দুইজন মানবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাঁহারা দুইজনেই ক্ষত্রিয়—একজন শ্রীকৃষ্ণ, আর-একজন শ্রীরামচন্দ্র। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় ক্ষত্রিয়দলের এই ভক্তিধর্ম যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তেমনি রামচন্দ্রের জীবনের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রচারলাভ করিয়াছিল।

বৃত্তিগত ভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই চিত্তগত ভেদ এমন একটা সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল যখন বিচ্ছেদের বিদারণ-রেখা দিয়া সামাজিক বিপ্লবের অগ্নি-উচ্ছ্বাস উদ্‌গিরিত হইতে আরম্ভ করিল। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যে এই বিপ্লবের ইতিহাস নিবদ্ধ হইয়া আছে।

এই বিপ্লবের ইতিহাসে ব্রাহ্মণপক্ষ বশিষ্ঠ নামটিকে ও ক্ষত্রিয়পক্ষ বিশ্বামিত্র নামটিকে আশ্রয় করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মাত্রই যে পরস্পরের বিরুদ্ধ দলে যোগ দিয়াছে তাহা নহে। এমন অনেক রাজা ছিলেন যাঁহারা ব্রাহ্মণদের স্বপক্ষে ছিলেন। কথিত আছে ব্রাহ্মণের বিদ্যা বিশ্বামিত্রের দ্বারা পীড়িত হইয়া রোদন করিতেছিল, হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; অবশেষে রাজ্য সম্পদ সমস্ত হারাইয়া বিশ্বামিত্রের কাছে তাঁহাকে সম্পূর্ণ হার মানিতে হইয়াছিল।

এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। প্রাচীনকালের এই মহাবিপ্লবের আর যে-একজন প্রধান নেতা শ্রীকৃষ্ণ কর্মকাণ্ডের নিরর্থকতা হইতে সমাজকে মুক্তি দিতে দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি একদিন পাণ্ডবদের সাহায্যে জরাসন্ধকে বধ করেন। সেই জরাসন্ধ রাজা তখনকার ক্ষত্রিয়দলের শত্রুপক্ষ ছিলেন। তিনি বিস্তর ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী ও পীড়িত করিয়াছিলেন। ভীমার্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরিতে হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ-পক্ষপাতী ক্ষত্রবিদ্বেষী রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা যে বধ করাইয়াছিলেন এটা একটা খাপছাড়া ঘটনামাত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তখন দুই দল হইয়াছিল। সেই দুই দলকে সমাজের মধ্যে এক করিবার চেষ্টায় যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয়

যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন শিশুপাল বিরুদ্ধদলের মুখপাত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেন। এই যজ্ঞে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, সমস্ত আচার্য ও রাজার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বপ্রধান বলিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছিল। এই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণের পদক্ষালনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন পরবর্তীকালের সেই অত্যুক্তির প্রয়াসেই পুরাকালীন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিরোধের ইতিহাস স্পষ্ট দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের গোড়ায় এই সামাজিক বিবাদ। তাহার এক দিকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ, অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষ। বিরুদ্ধপক্ষে সেনাপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণ— কৃপ ও অশ্বত্থামাও বড়ো সামান্য ছিলেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে, গোড়ায় ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন সমাজবিপ্লব। অর্থাৎ সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধ। রামায়ণের কালে রামচন্দ্র নূতন দলের পক্ষ লইয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। বশিষ্ঠের সনাতন ধর্মই ছিল রামের কুলধর্ম, বশিষ্ঠবংশই ছিল তাঁহাদের চিরপুরাতন পুরোহিতবংশ, তথাপি অল্পবয়সেই রামচন্দ্র সেই বশিষ্ঠের বিরুদ্ধপক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বস্তুত বিশ্বামিত্র রামকে তাঁহার পৈতৃক অধিকার হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। রাম যে পন্থা লইয়াছিলেন তাহাতে দশরথের সম্মতি ছিল না, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রবল প্রভাবের কাছে তাঁহার আপত্তি টিকিতে পারে নাই। পরবর্তীকালে এই কাব্য যখন জাতীয়সমাজে বৃহৎ ইতিহাসের স্মৃতিকে কোনো-এক রাজবংশের পারিবারিক ঘরের কথা করিয়া আনিয়াছিল তখনই দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ রাজার অদ্ভুত স্ত্রৈণতাকেই রামের বনবাসের কারণ বলিয়া রটাইয়াছে।

রামচন্দ্র যে নব্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহার আর-এক

প্রমাণ আছে। একদা যে ব্রাহ্মণ ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন তাঁহারই বংশোদ্‌ভব পরশুরামের ব্রত ছিল ক্ষত্রিয়বিনাশ। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়ের এই দুর্ধর্ষ শত্রুকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণবীরকে বধ না করিয়া তিনি তাঁহাকে যে বশ করিয়াছিলেন তাহাতে অনুমান করা যায়, ঐক্যসাধনব্রত গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র তাহার প্রথম পর্বেই কতক বীর্যবলে কতক ক্ষমাগুণে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধভঞ্জন করিয়াছিলেন। রামের জীবনের সকল কার্যেই এই উদার বীর্যবান্ সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বামিত্রই রামচন্দ্রকে জনকের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বেই রামচন্দ্র জনকের ভূকর্ষণজাত কন্যাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই-সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে হয়তো তথ্য খুঁজিলে ঠকিব, কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।

মূল কথা এই, জনক ক্ষত্রিয় রাজার আদর্শ ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছিল। এ বিদ্যা কেবলমাত্র তাঁহার জ্ঞানের বিষয় ছিল না ; এ বিদ্যা তাঁহার সমস্ত জীবনে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল ; তিনি তাঁহার রাজ্যসংসারের বিচিত্র কর্মের কেন্দ্রস্থলে এই ব্রহ্মজ্ঞানকে অবিচলিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা কীর্তিত হইয়াছে। চরমতম জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মে আশ্চর্য যোগসাধন ইহাই ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়দের সর্বোচ্চ কীর্তি। আমাদের দেশে যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের অগ্রণী ছিলেন তাঁহারা ত্যাগকেই ভোগের পরিণাম করিয়া কর্মকেই মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

এই জনক এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন, আর-এক দিকে স্বহস্তে

হলচালন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই জানিতে পারি কৃষিবিস্তারের দ্বারা আর্যসভ্যতা বিস্তার করা ক্ষত্রিয়দের একটি ব্রতের মধ্যে ছিল। একদিন পশুপালন আর্যদের বিশেষ উপজীবিকা ছিল। এই ধেনুই অরণ্যাশ্রম-বাসী ব্রাহ্মণদের প্রধান সম্পদ বলিয়া গণ্য হইত। বনভূমিতে গোচারণ সহজ; তপোবনে যাহারা শিষ্যরূপে উপনীত হইত গুরুর গোপালনে নিযুক্ত থাকা তাহাদের প্রধান কাজ ছিল।

অবশেষে একদিন রণজয়ী ক্ষত্রিয়েরা আর্যাবর্ত হইতে অরণ্যবাধা অপসারিত করিয়া পশুসম্পদের স্থলে কৃষিসম্পদকে প্রবল করিয়া তুলিলেন। আমেরিকায় য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ যখন অরণ্যের উচ্ছেদ করিয়া কৃষি-বিস্তারের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিতেছিলেন তখন যেমন মৃগয়াজীবী আরণ্যকগণ পদে পদে তাঁহাদিগকে বাধা দিতেছিল— ভারতবর্ষেও সেরূপ আরণ্যকদের সহিত কৃষকদের বিরোধে কৃষিব্যাপার কেবলই বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা অরণ্যের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র উন্মুক্ত করিতে যাইবেন তাঁহাদের কাজ সহজ ছিল না। জনক মিথিলার রাজা ছিলেন— ইহা হইতেই জানা যায় আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত আর্য উপনিবেশ আপনার সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল। তখন দুর্গম বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগে অরণ্য অক্ষত ছিল এবং দ্রাবিড়সভ্যতা সেই দিকেই প্রবল হইয়া আর্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। রাবণ বীরপরাক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি বেদের দেবতাকে পরাস্ত করিয়া আর্যদের যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইয়া নিজের দেবতা শিবকে জয়ী করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ে স্বকীয় দলের দেবতার প্রভাব প্রকাশ পায় পৃথিবীতে সকল সমাজেরই বিশেষ অবস্থায় এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকে— কোনো পক্ষের পরাভবে সে পক্ষের দেবতারই পরাভব গণ্য হয়। রাবণ আর্যদেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এই-যে লোকশ্রুতি আমাদের

দেশে প্রচলিত আছে ইহার অর্থই এই যে, তাঁহার রাজত্বকালে তিনি বৈদিক দেবতার উপাসকদিগকে বারম্বার পরাভূত করিয়াছিলেন।

এমন অবস্থায় সেই শিবের 'হরধনু' ভাঙিবে কে, একদিন এই এক প্রশ্ন আর্যসমাজে উঠিয়াছিল। শিবোপাসকদের প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া যিনি দক্ষিণখণ্ডে আর্যদের কৃষিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই যথার্থ ভাবে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জনকরাজার অমানুষিক মানসকন্যার সহিত পরিণীত হইবেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেই হরধনু ভঙ্গ করিবার দুঃসাধ্য পরীক্ষায় লইয়া গিয়াছিলেন। রাম যখন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল দুর্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনই তিনি হরধনুভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনই তিনি সীতাকে অর্থাৎ হলচালনরেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন। তখনকার অনেক বীর রাজাই এই সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা হরধনু ভাঙিতে পারেন নাই, এইজন্য রাজর্ষি জনকের কন্যাকে লাভ করিবার গৌরব হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই দুঃসাধ্য ব্রতের অধিকারী কে হইবেন, ক্ষত্রিয় তপস্বীগণ সেই সন্ধান হইতে বিরত হন নাই। একদা বিশ্বামিত্রের সেই সন্ধান রামচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া সার্থক হইল।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বাহির হইলেন তখন তরুণ বয়সেই তিনি তাঁহার জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম, তিনি শৈব রাক্ষসদিগকে পরাস্ত করিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, যে ভূমি হলচালনের অযোগ্যরূপে অহল্যা হইয়া, পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে ভূমিকা একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত

বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়া ছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন;[১] তৃতীয়, ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য আপন ভুজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

অকস্মাৎ যৌবরাজ্য-অভিষেকে বাধা পড়িয়া রামচন্দ্রের যে নির্বাসন ঘটিল তাহার মধ্যে সম্ভবত তখনকার দুই প্রবল পক্ষের বিরোধ সূচিত হইয়াছে। রামের বিরুদ্ধে যে-একটি দল ছিল তাহা নিঃসন্দেহ অত্যন্ত প্রবল—এবং স্বভাবতই অন্তঃপুরের মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল। বৃদ্ধ দশরথ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই-জন্য একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার প্রিয়তম বীরপুত্রকেও তিনি নির্বাসনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই নির্বাসনে রামের বীরত্বের সহায় হইলেন লক্ষ্মণ ও তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী হইলেন সীতা অর্থাৎ তাঁহার সেই ব্রত। এই সীতাকেই তিনি নানা বাধা ও নানা শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া বন হইতে বনান্তরে ঋষিদের আশ্রম ও রাক্ষসদের আবাসের মধ্য দিয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

আর্য-অনার্যের বিরোধকে বিদ্বেষের দ্বারা জাগ্রত রাখিয়া যুদ্ধের দ্বারা, নিধনের দ্বারা, তাহার সমাধানের প্রয়াস অন্তহীন দুশ্চেষ্টা। প্রেমের দ্বারা, মিলনের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে ইহার মীমাংসা হইলেই এত বড়ো বৃহৎ

১ অল্পদিন হইল "রাক্ষস-রহস্য"-নামক একটি স্বাধীনচিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ আমি পাণ্ডুলিপি আকারে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেই "অহল্যা" শব্দটির এই তাৎপর্যব্যাখ্যা আমি দেখিলাম। লেখক আপনার নাম প্রকাশ করেন নাই—তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ব্যাপারও সহজ হইয়া যায়। কিন্তু ভিতরের মিলন জিনিসটা তো ইচ্ছা করিলেই হয় না। ধর্ম যখন বাহিরের জিনিস হয়, নিজের দেবতা যখন নিজের বিষয়সম্পত্তির মতো অত্যন্ত স্বকীয় হইয়া থাকে, তখন মানুষের মনের মধ্যকার ভেদ কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। জ্যু'দের সঙ্গে জেণ্টাইলদের মিলনের কোনো সেতু ছিল না। কেননা, জ্যু'রা জিহোভাকে বিশেষভাবে আপনাদের জাতীয় সম্পত্তি বলিয়াই জানিত এবং এই জিহোভার সমস্ত অনুশাসন, তাঁহার আদিষ্ট সমস্ত বিধিনিষেধ, বিশেষভাবে জ্যু-জাতিরই পালনীয় এইরূপ তাহাদের ধারণা ছিল। তেমনি আর্য-দেবতা ও আর্যবিধিবিধান যখন বিশেষজাতিগত-ভাবে সংকীর্ণ ছিল তখন আর্য-অনার্যের পরস্পর সংঘাত, এক পক্ষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ছাড়া কিছুতেই মিটিতে পারিত না। কিন্তু ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দেবতার ধারণা যখন বিশ্ব-জনীন হইয়া উঠিল, বাহিরের ভেদ-বিভেদ একান্ত সত্য নহে এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষের কল্পনা হইতে দৈব বিভীষিকাসকল যখন চলিয়া গেল, তখনই আর্য-অনার্যের মধ্যে সত্যকার মিলনের সেতু স্থাপিত হওয়া সম্ভব-পর হইল। তখনই বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের দেবতা অন্তরের ভক্তির দেবতা হইয়া উঠিলেন এবং কোনো বিশেষ শাস্ত্র ও শিক্ষা ও জাতির মধ্যে তিনি আবদ্ধ হইয়া রহিলেন না।

ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিতের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে; শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপর আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে।

যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনীসৃষ্টির দ্বারাও স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়— আর্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শচরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচাররক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল। রামচরিতের মধ্যে যে-একটি সমাজবিপ্লবের ইতিহাস ছিল, পরবর্তীকালে যথাসম্ভব তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে নব্যকালের সামাজিক আদর্শের অনুগত করা হইয়াছিল। সেই সময়েই রামের চরিত্রকে গৃহধর্মের ও সমাজধর্মের আশ্রয়রূপে প্রচার করিবার চেষ্টা জাগিয়াছিল এবং রামচন্দ্র যে একদা তাঁহার স্বজাতিকে বিদ্বেষের সংকোচ হইতে প্রেমের প্রসারণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন ও সেই নীতির দ্বারা একটি বিষম সমস্যার সমাধান করিয়া সমস্ত জাতির নিকট চিরকালের মতো বরণীয় হইয়াছিলেন সে কথাটা সরিয়া গিয়াছে এবং ক্রমে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি শাস্ত্রানু-মোদিত গার্হস্থ্যের আশ্রয় ও লোকানুমোদিত আচারের রক্ষক; ইহার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার এই, এক কালে যে রামচন্দ্র ধর্মনীতি ও কৃষিবিদ্যাকে নূতন পথে চালনা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁহারই চরিতকে সমাজ পুরাতন বিধিবন্ধনের অনুকূল করিয়া ব্যবহার করিয়াছে। একদিন সমাজে যিনি গতির পক্ষে বীর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন আর-একদিন সমাজ তাঁহাকেই স্থিতির পক্ষে বীর বলিয়া প্রচার করিয়াছে। বস্তুত রামচন্দ্রের জীবনের কার্যে এই গতিস্থিতির সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল বলিয়াই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

তৎসত্ত্বেও এ কথা ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই যে, তিনি চণ্ডালের

মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন। তিনি শত্রুকে ক্ষয় করিয়াছিলেন এ তাঁহার গৌরব নহে, তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি আচারের নিষেধকে, সামাজিক বিদ্বেষের বাধাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি আর্য-অনার্যের মধ্যে প্রীতির সেতু বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন।

নৃতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্বর জাতির অনেকেরই মধ্যে এক-একটি বিশেষ জন্তু পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। অনেক সময়ে তাহারা আপনাদিগকে সেই জন্তুর বংশধর বলিয়া গণ্য করে। সেই জন্তুর নামেই তাহারা আখ্যাত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এইরূপে নাগবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কিষ্কিন্ধ্যায় রামচন্দ্র যে অনার্যদলকে বশ করিয়াছিলেন তাহারাও যে এইরূপ কারণেই বানর বলিয়া পরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল তো বানর নহে, রামচন্দ্রের দলে ভল্লুকও ছিল। বানর যদি অবজ্ঞাসূচক আখ্যা হইত তবে ভল্লুকের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

রামচন্দ্র এই-যে বানরদিগকে বশ করিয়াছিলেন তাহা রাজনীতির দ্বারা নহে, ভক্তিধর্মের দ্বারা। এইরূপে তিনি হনুমানের ভক্তি পাইয়া দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়, যে-কোনো মহাত্মাই বাহ্যধর্মের স্থলে ভক্তিধর্মকে জাগাইয়াছেন তিনি স্বয়ং পূজা লাভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, খৃস্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শিখ, সুফী, কবীরপন্থী প্রভৃতি সর্বত্রই দেখিতে পাই, ভক্তি যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় অনুবর্তীদের কাছে তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ভগবানের সহিত ভক্তের অন্তরতম যোগ উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া তাঁহারাও যেন দেবত্বের সহিত মনুষ্যত্বের ভেদসীমা অতিক্রম করিয়া

থাকেন। এইরূপে হনুমান ও বিভীষণ রামচন্দ্রের উপাসক ও ভক্ত বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়াছেন।

রামচন্দ্র ধর্মের দ্বারাই অনার্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ভক্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন নাই। দক্ষিণে তিনি কৃষিস্থিতিমূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সেই-যে বীজ রোপণ করিয়া আসিয়াছিলেন বহু শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষ তাহার ফল লাভ করিয়াছিল। এই দাক্ষিণাত্যে ক্রমে দারুণ শৈবধর্মও ভক্তিধর্মের রূপ গ্রহণ করিল এবং একদা এই দাক্ষিণাত্য হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার এক ধারায় ভক্তিস্রোত ও আর-এক ধারায় অদ্বৈতজ্ঞান উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া দিল।

আমরা আর্যদের ইতিহাসে সংকোচ ও প্রসারণের এই একটি রূপ দেখিলাম। মানুষের এক দিকে তাহার বিশেষত্ব, আর-এক দিকে তাহার বিশ্বত্ব, এই দুই দিকের টানই ভারতবর্ষে যেমন করিয়া কাজ করিয়াছে তাহা যদি আমরা আলোচনা করিয়া না দেখি তবে ভারতবর্ষকে আমরা চিনিতেই পারিব না। একদিন তাহার এই আত্মরক্ষণশক্তির দিকে ছিল ব্রাহ্মণ, আত্মপ্রসারণশক্তির দিকে ছিল ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় যখন অগ্রসর হইয়াছে তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে বাধা দিয়াছে, কিন্তু বাধা অতিক্রম করিয়াও ক্ষত্রিয় যখন সমাজকে বিস্তারের দিকে লইয়া গিয়াছে তখন ব্রাহ্মণ পুনরায় নূতনকে আপন পুরাতনের সঙ্গে বাঁধিয়া সমস্তটাকে আপন করিয়া লইয়া আবার একটা সীমা বাঁধিয়া লইয়াছে। য়ুরোপীয়েরা যখন ভারতবর্ষে চিরদিন ব্রাহ্মণদের এই কাজটির আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এমনি ভাবে করিয়াছেন যেন এই ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ-নামক একটি বিশেষ ব্যবসায়ী দলের

চাতুরী। তাঁহারা ইহা ভুলিয়া যান যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যথার্থ জাতিগত ভেদ নাই, তাহারা একই জাতির দুই স্বাভাবিক শক্তি। ইংলন্ডে সমস্ত ইংরেজ জাতি লিবারাল ও কন্‌সার্‌ভেটিভ এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া রাষ্ট্রনীতিকে চালনা করিতেছে— ক্ষমতালাভের জন্য এই দুই শাখার প্রতিযোগিতার মধ্যে বিবাদও আছে, কৌশলও আছে, এমন-কি, ঘুষ এবং অন্যায়ও আছে, তথাপি এই দুই সম্প্রদায়কে যেমন দুই স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ পক্ষের মতো করিয়া দেখিলে ভুল দেখা হয়— বস্তুত তাহারা প্রকৃতির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-শক্তির মতো বাহিরে দেখিতে বিরুদ্ধ, কিন্তু অন্তরে একই সৃজন-শক্তির এ পিঠ, ও পিঠ, তেমনি ভারতবর্ষে সমাজের স্বাভাবিক স্থিতি ও গতি-শক্তি দুই শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া ইতিহাসকে সৃষ্টি করিয়াছে; কোনো পক্ষেই তাহা কৃত্রিম নহে।

তবে দেখা গিয়াছে বটে ভারতবর্ষে এই স্থিতি ও গতি-শক্তির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই, সমস্ত বিরোধের পর ব্রাহ্মণই এখানকার সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের বিশেষ চাতুর্যই তাহার কারণ এমন অদ্ভুত কথা নিতান্তই ইতিহাসবিরুদ্ধ কথা। তাহার প্রকৃত কারণ ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যে জাতিসংঘাত ঘটিয়াছে তাহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ জাতির সংঘাত। তাহাদের মধ্যে বর্ণের ও আদর্শের ভেদ এতই গুরুতর যে এই প্রবল বিরুদ্ধতার আঘাতে ভারতবর্ষের আত্ম-রক্ষণী শক্তিই বলবান হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আত্মপ্রসারণের দিকে চলিতে গেলে আপনাকে হারাইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া সমাজের সতর্কতাবৃত্তি পদে পদে আপনাকে জাগ্রত রাখিয়াছে।

তুষারাবৃত আল্‌প্‌স্‌ গিরিমালার শিখরে যে দুঃসাহসিকেরা আরোহণ করিতে চেষ্টা করে তাহারা আপনাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া অগ্রসর

হয়— তাহারা চলিতে চলিতে আপনাকে বাঁধে, বাঁধিতে বাঁধিতে চলে— সেখানে চলিবার উপায় স্বভাবতই এই প্রণালী অবলম্বন করে, তাহা চালকদের কৌশল নহে। বন্দীশালায় যে বন্ধনে স্থির করিয়া রাখে দুর্গম পথে সেই বন্ধনই গতির সহায়। ভারতবর্ষেও সমাজ কেবলই দড়িদড়া লইয়া আপনাকে বাঁধিতে বাঁধিতে চলিয়াছে, কেননা নিজের পথে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা পিছলিয়া অন্যের পথে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তাহার সম্পূর্ণ ছিল। এইজন্যই ভারতবর্ষে স্বভাবের নিয়মে আত্মরক্ষণী শক্তি আত্ম-প্রসারণী শক্তির অপেক্ষা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে।

রামচন্দ্রের জীবন-আলোচনায় আমরা ইহাই দেখিলাম যে, ক্ষত্রিয়েরা একদিন ধর্মকে এমন একটা ঐক্যের দিকে পাইয়াছিলেন যাহাতে অনার্যদের সহিত বিরুদ্ধতাকে তাঁহারা মিলননীতির দ্বারাই সহজে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। দুই পক্ষের চিরন্তন প্রাণান্তিক সংগ্রাম কখনো কোনো সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না— হয় এক পক্ষকে মারিতে, নয় দুই পক্ষকে মিলিতে হইবে। ভারতবর্ষে একদা ধর্মকে আশ্রয় করিয়া সেই মিলনের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে এই ধর্ম ও এই মিলননীতি বাধা পাইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে ব্রাহ্মণেরা ইহাকে স্বীকার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইলেন।

আর্যে অনার্যে যখন অল্প অল্প করিয়া যোগ স্থাপন হইতেছে তখন অনার্যদের ধর্মের সঙ্গেও বোঝাপড়া করার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। এই সময়ে অনার্যদের দেবতা শিবের সঙ্গে আর্য-উপাসকদের একটা বিরোধ চলিতেছিল, এবং সেই বিরোধে কখনো আর্যেরা কখনো অনার্যেরা জয়ী হইতেছিল। কৃষ্ণের অনুবর্তী অর্জুন কিরাতদের দেবতা শিবের কাছে একদিন হার মানিয়াছিলেন। শিবভক্ত বাণ-অসুরের কন্যা উষাকে কৃষ্ণের

পৌত্র অনিরুদ্ধ হরণ করিয়াছিলেন— এই সংগ্রামে কৃষ্ণ জয়ী হইয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞে অনার্য শিবকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, সেই উপলক্ষ্যে শিবের অনার্য-অনুচরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিল। অবশেষে শিবকে বৈদিক রুদ্রের সহিত মিলাইয়া একদিন তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়া আর্য-অনার্যের এই ধর্মবিরোধ মিটাইতে হইয়াছিল। তথাপি দেবতা যখন অনেক হইয়া পড়েন তখন তাঁহাদের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো সে বিবাদ সহজে মিটিতে চায় না। তাই মহাভারতে রুদ্রের সহিত বিষ্ণুর সংগ্রামের উল্লেখ আছে— সেই সংগ্রামে রুদ্র বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

মহাভারত আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্যদের সহিত অনার্যদের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল। এইরূপে যতই বর্ণসংকর ও ধর্মসংকর উৎপন্ন হইতে লাগিল ততই সমাজের আত্মরক্ষণীশক্তি বারম্বার সীমানির্ণয় করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই তাহাকে গ্রহণ করিয়া বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছে। মনুতে বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা আছে এবং তাহাতে মূর্তিপূজা-ব্যবসায়ী দেবল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় রক্তে ও ধর্মে অনার্যদের মিশ্রণকে গ্রহণ করিয়াও তাহাকে বাধা দিবার প্রয়াস কোনো দিন নিরস্ত হয় নাই। এইরূপে প্রসারণের পরমুহূর্তেই সংকোচন আপনাকে বারম্বার অত্যন্ত কঠিন করিয়া তুলিয়াছে।

একদিন ইহারই একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের দুই ক্ষত্রিয় রাজসন্ন্যাসীকে আশ্রয় করিয়া প্রচণ্ডশক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়মমাত্র নহে— সেই

ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, সামাজিক বাহ্য প্রথা-পালনের দ্বারা নহে— এই ধর্মনীতি যে মানুষের সহিত মানুষের কোনো ভেদকে চিরন্তন সত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারে না, ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য এই যে, তাহা দেখিতে দেখিতে জাতির চিরন্তন সংস্কার ও বাধা অতিক্রম করিয়া সমস্ত দেশকে অধিকার করিয়া লইল। এইবার অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়গুরুর প্রভাব ব্রাহ্মণের শক্তিকে একেবারে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল।

সেটা সম্পূর্ণ ভালো হইয়াছিল এমন কথা কোনোমতেই বলিতে পারি না। এইরূপ এক পক্ষের ঐকান্তিকতায় জাতি প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না, তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে বাধ্য। এই কারণেই বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কারজাল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া যেরূপ সংস্কারজালে বদ্ধ করিয়া দিয়াছে এমন আর কোনোকালেই করে নাই। এতদিন ভারতবর্ষে আর্য-অনার্যের যে মিলন ঘটিতেছিল তাহার মধ্যে পদে পদে একটা সংযম ছিল— মাঝে মাঝে বাঁধ বাঁধিয়া প্রলয়স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখা হইতেছিল। আর্যজাতি অনার্যের কাছ হইতে যাহা-কিছু গ্রহণ করিতেছিল তাহাকে আর্য করিয়া লইয়া আপন প্রকৃতির অনুগত করিয়া লইতেছিল— এমনি করিয়া ধীরে ধীরে একটি প্রাণবান জাতীয় কলেবর গড়িয়া আর্যে অনার্যে একটি আন্তরিক সংস্রব ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিতেছিল। নিশ্চয়ই সেই মিলন-ব্যাপারের মাঝখানে কোনো-এক সময়ে বাঁধাবাঁধি ও বাহ্যিকতার মাত্রা অত্যন্ত বেশি হইয়া পড়িয়াছিল, নহিলে এত বড়ো বিপ্লব উৎপন্ন হইতেই পারিত না এবং সে বিপ্লব কোনো সৈন্যবল আশ্রয় না করিয়া কেবলমাত্র ধর্মবলে সমস্ত দেশকে এমন করিয়া

আচ্ছন্ন করিতে পারিত না। নিশ্চয়ই তৎপূর্বে সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও মানুষের অন্তরে বাহিরে বৃহৎ একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়াও তেমনি প্রবল হইয়া একেবারে সমাজের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল। রোগের আক্রমণও যেমন নিদারুণ, চিকিৎসার আক্রমণও তেমনি সাংঘাতিক হইয়া প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন এই বৌদ্ধপ্রভাবের বন্যা যখন সরিয়া গেল তখন দেখা গেল সমাজের সমস্ত বেড়াগুলা ভাঙিয়া গিয়াছে। যে-একটি ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের জাতিবৈচিত্র্য ঐক্যলাভের চেষ্টা করিতেছিল সেই ব্যবস্থাটা ভূমিসাৎ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ঐক্যের চেষ্টাতেই ঐক্য নষ্ট করিয়াছে। ভারতবর্ষে সমস্ত অনৈক্যগুলি অবাধে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল— যাহা বাগান ছিল তাহা জঙ্গল হইয়া উঠিল।

তাহার প্রধান কারণ এই, একদিন ভারতসমাজে কখনো ব্রাহ্মণ কখনো ক্ষত্রিয় যখন প্রাধান্য লাভ করিতেছিলেন তখনও উভয়ের ভিতরকার একটা জাতিগত ঐক্য ছিল। এইজন্য তখনকার জাতি-রচনাকার্য আর্যদের হাতেই ছিল। কিন্তু বৌদ্ধপ্রভাবের সময় কেবল ভারতবর্ষের ভিতরকার অনার্যেরা নহে, ভারতবর্ষের বাহির হইতেও অনার্যদের সমাগম হইয়া তাহারা এমন একটি প্রবলতা লাভ করিল যে আর্যদের সহিত তাহাদের সুবিহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। যতদিন বৌদ্ধধর্মের বল ছিল ততদিন এই অসামঞ্জস্য অস্বাস্থ্য-আকারে প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যখন দুর্বল হইয়া পড়িল তখন তাহা নানা অদ্ভুত অসংগতিরূপে অবাধে সমস্ত দেশকে একেবারে ছাইয়া ফেলিল।

অনার্যেরা এখন সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া একেবারে সমাজের মাঝখানে আসিয়া বসিয়াছে ; সুতরাং এখন তাহাদের সহিত ভেদ ও মিলন বাহিরের নহে, তাহা একেবারে সমাজের ভিতরের কথা হইয়া পড়িল।

এই বৌদ্ধপ্লাবনে আর্যসমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণসম্প্রদায় আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিয়াছিল, কারণ, আর্যজাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ভার চিরকাল ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন তখনও ধর্মসমাজে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এ ভেদ বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তখন সমাজে আর-সমস্ত ভেদই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলাইয়া গিয়াছিল।

অনার্যের সহিত বিবাহসম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ের প্রায় কোনো বাধা ছিল না তাহা পুরাণে স্পষ্টই দেখা যায়। এইজন্য দেখা যায় বৌদ্ধযুগের পরবর্তী অধিকাংশ রাজবংশ ক্ষত্রিয়বংশ নহে।

এ দিকে শক হুন প্রভৃতি বিদেশীয় অনার্যগণ দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সমাজের মধ্যে অবাধে মিশিয়া যাইতে লাগিল— বৌদ্ধধর্মের কাটা খাল দিয়া এই-সমস্ত বন্যার জল নানা শাখায় একেবারে সমাজের মর্মস্থলে প্রবেশ করিল। কারণ, বাধা দিবার ব্যবস্থাটা তখন সমাজ-প্রকৃতির মধ্যে দুর্বল। এইরূপে ধর্মে কর্মে অনার্যসম্মিশ্রণ অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সর্বপ্রকার অদ্ভুত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যখন কোনো সংগতির সূত্র রহিল না তখনই সমাজের অন্তরস্থিত আর্যপ্রকৃতি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিল। আর্যপ্রকৃতি নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়াই নিজেকে সুস্পষ্টরূপে আবিষ্কার করিবার জন্য তাহার একটা চেষ্টা উদ্যত হইয়া উঠিল।

আমরা কী এবং কোন্ জিনিসটা আমাদের— চারি দিকের বিপুল

বিশ্লিষ্টতার ভিতর হইতে এইটেকে উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল। সেই যুগেই ভারতবর্ষ আপনাকে ভারতবর্ষ বলিয়া সীমাচিহ্নিত করিল। তৎপূর্বে বৌদ্ধসমাজের যোগে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এত দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, সে আপনার কলেবরটাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পাইতেছিল না। এইজন্য আর্য-জনশ্রুতিতে-প্রচলিত কোনো পুরাতন চক্রবর্তী সম্রাটের রাজ্যসীমার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনার ভৌগোলিক সত্তাকে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। তাহার পরে, সামাজিক প্রলয়ঝড়ে আপনার ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলিকে খুঁজিয়া লইয়া জোড়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সময়েই সংগ্রহকর্তাদের কাজ দেশের প্রধান কাজ হইল। তখনকার যিনি ব্যাস নূতন রচনা তাঁহার কাজ নহে, পুরাতন সংগ্রহেই তিনি নিযুক্ত। এই ব্যাস এক ব্যক্তি না হইতে পারেন, কিন্তু ইনি সমাজের একই শক্তি। কোথায় আর্যসমাজের স্থিরপ্রতিষ্ঠা ইনি তাহাই খুঁজিয়া একত্র করিতে লাগিলেন।

সেই চেষ্টার বশে ব্যাস বেদ সংগ্রহ করিলেন। যথার্থ বৈদিককালে মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রণালীগুলিকে সমাজ যত্ন করিয়া শিখিয়াছে ও রাখিয়াছে, তবু তখন তাহা শিক্ষণীয় বিদ্যামাত্র ছিল এবং সে বিদ্যাকেও সকলে পরাবিদ্যা বলিয়া মানিত না।

কিন্তু একদিন বিশ্লিষ্ট সমাজকে বাঁধিয়া তুলিবার জন্য এমন একটি পুরাতন শাস্ত্রকে মাঝখানে দাঁড় করাইবার দরকার হইয়াছিল যাহার সম্বন্ধে নানা লোক নানা প্রকার তর্ক করিতে পারিবে না— যাহা আর্যসমাজের সর্বপুরাতন বাণী ; যাহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র বিরুদ্ধসম্প্রদায়ও এক হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এই জন্য বেদ যদিচ প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে তখন অনেক দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল তথাপি দূরের জিনিস

বলিয়াই তাহাকে দূর হইতে মান্য করা সকলের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। আসল কথা, যে জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল কোনো একটি দৃঢ়নিশ্চল কেন্দ্রকে স্বীকার না করিলে তাহার পরিধি-নির্ণয় কঠিন হয়। তাহার পরে আর্যসমাজে যত-কিছু জনশ্রুতি খণ্ড খণ্ড আকারে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল তাহাদিগকেও একত্র করিয়া মহাভারত নামে সংকলিত করা হইল।

যেমন একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন তেমনি একটি ধারাবাহিক পরিধিস্থত্রও তো চাই— সেই পরিধিস্থত্রই ইতিহাস। তাই ব্যাসের আর-এক কাজ হইল ইতিহাস সংগ্রহ করা। আর্যসমাজের যত-কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল তাহাদিগকে তিনি এক করিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। এই নামের মধ্যেই তখনকার আর্যজাতির একটি ঐক্য-উপলব্ধির চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা-অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে, কিন্তু ইহা যথার্থ ই আর্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত। কোনো বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি এই-সমস্ত জনশ্রুতিকে গলাইয়া পোড়াইয়া বিশ্লিষ্ট করিয়া ইহা হইতে তথ্যমূলক ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করিত তবে আর্যসমাজের ইতিহাসের সত্য স্বরূপটি আমরা দেখিতে পাইতাম না। মহাভারত সংগ্রহের দিনে আর্যজাতির ইতিহাস আর্যজাতির স্মৃতিপটে যেরূপ রেখায় আঁকা ছিল, তাহার মধ্যে কিছু বা স্পষ্ট কিছু বা লুপ্ত, কিছু বা সুসংগত কিছু বা পরস্পরবিরুদ্ধ— মহাভারতে সেই সমস্তেরই প্রতিলিপি একত্র করিয়া রক্ষিত হইয়াছে।

এই মহাভারতে কেবল যে নির্বিচারে জনশ্রুতি সংকলন করা হইয়াছে তাহাও নহে। আতস-কাচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর-এক পিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি এক দিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি, আর-এক দিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি— সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্গীতা। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়-যোগ তাহাই সমস্ত ভারত-ইতিহাসের চরমতত্ত্ব। নিঃসন্দেহই পৃথিবীর সকল জাতিই আপন ইতিহাসের ভিতর দিয়া কোনো সমস্যার মীমাংসা, কোনো তত্ত্বনির্ণয় করিতেছে— ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো-একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে— নিজের এই সন্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না; অনেকে মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূল অভিপ্রায় ও চরম গম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের ইতিহাসে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম অনেক সময়ে স্বতন্ত্রভাবে, এমন-কি পরস্পরবিরুদ্ধভাবে আপনার পথে চলে; সেই বিরোধের বিপ্লব ভারতবর্ষে খুব করিয়াই ঘটিয়াছে বলিয়াই এক জায়গায় তাহার সমন্বয়টিকে স্পষ্ট করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের সকল চেষ্টাই কোন্‌খানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা। এই গীতার মধ্যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা লজিক-গত অসংগতি দেখিতে পান। ইহাতে সাংখ্য বেদান্ত এবং যোগকে যে একত্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা মনে করেন সেটা একটা জোড়াতাড়া ব্যাপার— অর্থাৎ, তাঁহাদের মতে ইহার মূলটি সাংখ্য ও যোগ, বেদান্তটি তাহার পরবর্তী কোনো সম্প্রদায়ের দ্বারা যোজনা করা। হইতেও পারে— মূল ভগবদ্গীতা ভারতবর্ষের

সাংখ্য ও যোগতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উপদিষ্ট, কিন্তু মহাভারত-সংকলনের যুগে সেই মূলের বিশুদ্ধতা-রক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। সমস্ত জাতির চিত্তকে সমগ্র করিয়া এক করিয়া দেখাই তখনকার সাধনা ছিল। অতএব যে গ্রন্থে তত্ত্বের সহিত জীবনকে মিলাইয়া মানুষের কর্তব্যপথ নির্দেশ করা হইয়াছে সে গ্রন্থে বেদান্ততত্ত্বকে তাঁহারা বাদ দিতে পারেন নাই। সাংখ্যই হোক, যোগই হোক, বেদান্তই হোক, সকল তত্ত্বেরই কেন্দ্রস্থলে একই বস্তু আছেন; তিনি কেবলমাত্র জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের আশ্রয় নহেন, তিনি পরিপূর্ণ মানবজীবনের পরমাগতি, তাঁহাতে আসিয়া না মিলিলে কোনো কথাই সত্যে আসিয়া পৌঁছিতে পারে না— অতএব ভারতচিত্তের সমস্ত প্রয়াসকেই সেই এক মূল সত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাভারতের দেখা। তাই মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে। তাহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা, সংগতি ও অসংগতির মধ্যে গভীরতম এই একটি উপলব্ধি দেখা যায় যে, সমস্তকে লইয়াই সত্য, অতএব এক জায়গায় মিল আছেই। এমন-কি, গীতায় যজ্ঞকেও সাধনা-ক্ষেত্রে স্থান দিয়াছে। কিন্তু গীতায় যজ্ঞব্যাপার এমন একটি বড়ো ভাব পাইয়াছে যাহাতে তাহার সংকীর্ণতা ঘুচিয়া সে একটি বিশ্বের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। যে-সকল ক্রিয়াকলাপে মানুষ আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বশক্তিকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলে তাহাই মানুষের যজ্ঞ। গীতাকার যদি এখনকার কালের লোক হইতেন তবে সমস্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যবসায়ের মধ্যে তিনি মানুষের সেই যজ্ঞকে দেখিতে পাইতেন। যেমন জ্ঞানের দ্বারা অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে যোগ, কর্মের দ্বারা অনন্ত মঙ্গলের সঙ্গে যোগ, ভক্তির দ্বারা অনন্ত ইচ্ছার সঙ্গে যোগ, তেমনি যজ্ঞের দ্বারা অনন্ত শক্তির সঙ্গে আমাদের

যোগ—এইরূপে গীতায় ভূমার সঙ্গে মানুষের সকল প্রকারের যোগকেই সম্পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন—একদা যজ্ঞকাণ্ডের দ্বারা মানুষের যে চেষ্টা বিশ্বশক্তির সিংহদ্বারে আঘাত করিতেছিল গীতা তাহাকেও সত্য বলিয়া দেখিয়াছেন।

এইরূপে ইতিহাসের নানা বিক্ষিপ্ততার মধ্য হইতে তখনকার কালের প্রতিভা যেমন একটি মূলসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল তেমনি বেদের মধ্য হইতেও তাহা একটি সূত্র উদ্ধার করিয়াছিল তাহাই ব্রহ্মসূত্র। তখনকার ব্যাসের এও একটি কীর্তি। তিনি যেমন এক দিকে ব্যষ্টিকে রাখিয়াছেন আর-এক দিকে তেমনি সমষ্টিকেও প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছেন; তাঁহার সংকলন কেবল আয়োজনমাত্র নহে, তাহা সংযোজন; শুধু সঞ্চয় নহে, তাহা পরিচয়। সমস্ত বেদের নানা পথের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্তের একটি সন্ধান ও একটি লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাই বেদান্ত। তাহার মধ্যে একটি দ্বৈতেরও দিক আছে একটি অদ্বৈতেরও দিক আছে, কারণ, এই দুইটি দিক ব্যতীত কোনো-একটি দিকও সত্য হইতে পারে না। লজিক ইহার কোনো সমন্বয় পায় না, এইজন্য যেখানে ইহার সমন্বয় সেখানে ইহাকে অনির্বচনীয় বলা হয়। ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রে এই দ্বৈত অদ্বৈত দুই দিককেই রক্ষা করা হইয়াছে। এইজন্য পরবর্তীকালে এই একই ব্রহ্মসূত্রকে লজিক নানা বাদবিবাদে বিভক্ত করিতে পারিয়াছে। ফলত ব্রহ্মসূত্রে আর্যধর্মের মূলতত্ত্বটি-দ্বারা সমস্ত আর্যধর্মশাস্ত্রকে এক আলোকে আলোকিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কেবল আর্যধর্ম কেন, সমস্ত মানবের ধর্মের ইহাই এক আলোক।

এইরূপে নানা বিরুদ্ধতার দ্বারা পীড়িত আর্যপ্রকৃতি একদিন আপনার সীমা নির্ণয় করিয়া আপনার মূল ঐক্যটি লাভ করিবার জন্য একান্ত যত্নে

প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহার লক্ষণ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই আর্য জাতির বিধিনিষেধগুলি যাহা কেবল স্মৃতিরূপে নানা স্থানে ছড়াইয়া ছিল এই সময়ে তাহাও সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল।

আমরা এই-যে মহাভারতের কথা এখানে আলোচনা করিলাম ইহাকে কেহ যেন কালগত যুগ না মনে করেন—ইহা ভাবগত যুগ—অর্থাৎ আমরা কোনো-একটি সংকীর্ণ কালে ইহাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিতে পারি না। বৌদ্ধযুগের যথার্থ আরম্ভ কবে তাহা সুস্পষ্টরূপে বলা অসম্ভব; শাক্যসিংহের বহু পূর্বেই যে তাহার আয়োজন চলিতেছিল এবং তাঁহার পূর্বেও যে অন্য বুদ্ধ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা একটি ভাবের ধারাপরম্পরা যাহা গৌতমবুদ্ধে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। মহাভারতের যুগও তেমনি কবে আরম্ভ তাহা স্থির করিয়া বলিলে ভুল বলা হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজের মধ্যে ছড়ানো ও কুড়ানো এক সঙ্গেই চলিতেছে। যেমন পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা। ইহা যে পুরাতন পক্ষ ও নূতন পক্ষের বোঝাপড়া তাহাতে সন্দেহ নাই। এক পক্ষ বলিতেছেন, যে-সকল মন্ত্র ও কর্মকাণ্ড চলিয়া আসিয়াছে তাহা অনাদি, তাহার বিশেষ গুণবশতই তাহার দ্বারাই চরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। অপর পক্ষ বলিতেছেন, জ্ঞান ব্যতীত আর কোনো উপায়ে মুক্তি নাই। যে দুই গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া এই দুই মত বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহার রচনাকাল যখনই হউক, এই মতদ্বৈধ যে অতি পুরাতন তাহা নিঃসন্দেহ। এইরূপ আর্যসমাজের যে উদ্যম আপনার সামগ্রীগুলিকে বিশেষভাবে সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যাহা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ সংকলন করিয়া স্বজাতির প্রাচীন পথটিকে চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছে তাহা বিশেষ কোনো সময়ে সীমাবদ্ধ নহে। আর্য-অনার্যের চিরন্তন সংমিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গেই

ভারতবর্ষের এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি চিরকালই কাজ করিয়া আসিয়াছে ইহাই আমাদের বক্তব্য।

এ কথা কেহ যেন না মনে করেন যে অনার্যেরা আমাদিগকে দিবার মতো কোনো জিনিস দেয় নাই। বস্তুত প্রাচীন দ্রাবিড়গণ সভ্যতায় হীন ছিল না। তাহাদের সহযোগে হিন্দুসভ্যতা রূপে বিচিত্র ও রসে গভীর হইয়াছে। দ্রাবিড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিল না, কিন্তু কল্পনা করিতে, গান করিতে এবং গড়িতে পারিত। কলাবিদ্যায় তাহারা নিপুণ ছিল এবং তাহাদের গণেশ-দেবতার বধূ ছিল কলাবধূ। আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্‌ভাবনী শক্তির সম্মিশ্রণ-চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আর্যও নহে, সম্পূর্ণ অনার্যও নহে, তাহাই হিন্দু। এই দুই বিরুদ্ধের নিরন্তর সমন্বয়-প্রয়াসে ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য সামগ্রী পাইয়াছে। তাহা অনন্তকে অন্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে এবং ভূমাকে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। এই কারণেই ভারতবর্ষে এই দুই বিরুদ্ধ যেখানে না মেলে সেখানে মূঢ়তা ও অন্ধ সংস্কারের আর অন্ত থাকে না; যেখানে মেলে সেখানে অনন্তের অন্তহীন রসরূপ আপনাকে অবাধে সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। এই কারণেই ভারতবর্ষ এমন একটি জিনিস পাইয়াছে যাহাকে ঠিকমত ব্যবহার করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং ঠিকমত ব্যবহার করিতে না পারিলে যাহা জাতির জীবনকে মূঢ়তার ভারে ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া দেয়। আর্য ও দ্রাবিড়ের এই চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধতার সম্মিলন যেখানে সিদ্ধ হইয়াছে সেখানে সৌন্দর্য জাগিয়াছে, যেখানে হওয়া সম্ভবপর হয় নাই সেখানে কদর্যতার সীমা দেখি না। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, শুধু দ্রাবিড় নহে, বর্বর অনার্যদের সামগ্রীও একদিন দ্বার

খোলা পাইয়া অসংকোচে আর্যসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এই অনধিকার-প্রবেশের বেদনাবোধ বহুকাল ধরিয়া আমাদের সমাজে সুতীব্র হইয়া ছিল।

যুদ্ধ এখন বাহিরে নহে, যুদ্ধ এখন দেহের মধ্যে— কেননা, অস্ত্র এখন শরীরের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে, শত্রু এখন ঘরের ভিতরে। আর্য-সভ্যতার পক্ষে ব্রাহ্মণ এখন একমাত্র। এইজন্য এই সময়ে বেদ যেমন অভ্রান্ত ধর্মশাস্ত্ররূপে সমাজস্থিতির সেতু হইয়া দাঁড়াইল, ব্রাহ্মণও সেইরূপ সমাজে সর্বোচ্চ পূজ্যপদ গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখনকার পুরাণে ইতিহাসে কাব্যে সর্বত্রই এই চেষ্টা এমনি প্রবল আকারে পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইতেছে যে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাহা একটা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রয়াস, তাহা উজান-স্রোতে গুণ টানা, এইজন্য গুণবন্ধন অনেকগুলি এবং কঠিন টানের বিরামমাত্র নাই। ব্রাহ্মণের এই চেষ্টাকে কোনো-একটি সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতালাভের চেষ্টা মনে করিলে ইতিহাসকে সংকীর্ণ ও মিথ্যা করিয়া দেখা হয়। এ চেষ্টা তখনকার সংকটগ্রস্ত আর্যজাতির অন্তরের চেষ্টা। ইহা আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রযত্ন। তখন সমস্ত সমাজের লোকের মনে ব্রাহ্মণের প্রভাবকে সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিতে না পারিলে যাহা চারি দিকে ভাঙিয়া পড়িতেছিল তাহাকে জুড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় ছিল না।

এই অবস্থায় ব্রাহ্মণদের দুইটি কাজ হইল। এক, পূর্বধারাকে রক্ষা করা ; আর-এক, নূতনকে তাহার সহিত মিলাইয়া লওয়া। জীবনীপ্রক্রিয়ার এই দুইটি কাজই তখন অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও অধিকারকে এমন অপরিমিত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। অনার্যদেবতাকে বেদের প্রাচীন মঞ্চে তুলিয়া লওয়া হইল, বৈদিক রুদ্র-

উপাধি গ্রহণ করিয়া শিব আর্যদেবতার দলে স্থান পাইলেন। এইরূপে ভারতবর্ষে সামাজিক মিলন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে রূপ গ্রহণ করিল। ব্রহ্মায় আর্যসমাজের আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল, এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল।

শিব যদিচ রুদ্রনামে আর্যসমাজে প্রবেশ করিলেন তথাপি তাঁহার মধ্যে আর্য ও অনার্য এই দুই মূর্তিই স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। আর্যের দিকে তিনি যোগীশ্বর, কামকে ভস্ম করিয়া নির্বাণের আনন্দে নিমগ্ন, তাঁহার দিগ্‌বাস সন্ন্যাসীর ত্যাগের লক্ষণ; অনার্যের দিকে তিনি বীভৎস, রক্তাক্তগজাজিন-ধারী, গঞ্জিকা ও ভাঙ-ধুতুরায় উন্মত্ত। আর্যের দিকে তিনি বুদ্ধেরই প্রতিরূপ এবং সেই রূপেই তিনি সর্বত্র সহজেই বুদ্ধমন্দিরসকল অধিকার করিতেছেন; অন্য দিকে তিনি ভূত প্রেত প্রভৃতি শ্মশানচর সমস্ত বিভীষিকা এবং সর্পপূজা, বৃষপূজা, বৃক্ষপূজা, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া সমাজের অন্তর্গত অনার্যদের সমস্ত তামসিক উপাসনাকে আশ্রয় দান করিতেছেন। এক দিকে প্রবৃত্তিকে শান্ত করিয়া নির্জনে ধ্যানে জপে তাঁহার সাধনা; অন্য দিকে চড়কপূজা প্রভৃতি ব্যাপারে নিজেকে প্রমত্ত করিয়া ও শরীরকে নানা প্রকারে ক্লেশে উত্তেজিত করিয়া নিদারুণভাবে তাঁহার আরাধনা।

এইরূপে আর্য-অনার্যের ধারা গঙ্গাযমুনার মতো একত্র হইল, তবু তাহার দুই রঙ পাশাপাশি রহিয়া গেল। এইরূপে বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে কৃষ্ণের নামকে আশ্রয় করিয়া যে-সমস্ত কাহিনী প্রবেশ করিল তাহা পাণ্ডবসখা ভাগবতধর্মপ্রবর্তক বীরশ্রেষ্ঠ দ্বারকাপুরীর শ্রীকৃষ্ণের কথা নহে। বৈষ্ণব ধর্মের এক দিকে ভগবদ্গীতার বিশুদ্ধ অবিমিশ্র উচ্চ ধর্মতত্ত্ব রহিল, আর-এক দিকে অনার্য আভীর গোপজাতির লোকপ্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা তাহার সহিত যুক্ত হইল। শৈব ধর্মকে আশ্রয় করিয়া যে জিনিসগুলি মিলিত

হইল তাহা নিরাভরণ এবং নিদারুণ; তাহার শান্তি এবং তাহার মত্ততা, তাহার স্থাণুবৎ অচল স্থিতি এবং তাহার উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য, উভয়ই বিনাশের ভাবসূত্রটিকে আশ্রয় করিয়া গাঁথা পড়িল। বাহিরের দিকে তাহা আসক্তি-বন্ধন ছেদন ও মৃত্যু, অন্তরের দিকে তাহা একের মধ্যে বিলয়— ইহাই আর্য সভ্যতার অদ্বৈতসূত্র; ইহাই নেতি-নেতির দিক; ত্যাগ ইহার আভরণ, শ্মশানেই ইহার বাস। বৈষ্ণব ধর্মকে আশ্রয় করিয়া লোকপ্রচলিত যে পুরাণকাহিনী আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার মধ্যে প্রেমের, সৌন্দর্যের এবং যৌবনের লীলা; প্রলয়পিনাকের স্থলে সেখানে বাঁশির ধ্বনি; ভূতপ্রেতের স্থলে সেখানে গোপিনীদের বিলাস; সেখানে বৃন্দাবনের চিরবসন্ত এবং গোলকধামের চির-ঐশ্বর্য; এইখানে আর্যসভ্যতার দ্বৈতসূত্র।

একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। এই-যে আভীরসম্প্রদায়-প্রচলিত কৃষ্ণকথা বৈষ্ণব ধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাহার কারণ এই যে, এখানে পরস্পর মিশিবার একটি সত্য পথ ছিল। নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধকে জীব ও ভগবানের সম্বন্ধের রূপক ভাবে পৃথিবীর নানা স্থানেই মানুষ স্বীকার করিয়াছে। আর্যবৈষ্ণব ভক্তির এই তত্ত্বটিকে অনার্যদের কাহিনীর সঙ্গে মিলিত করিয়া সেই-সমস্ত কাহিনীকে একটি উচ্চতম সত্যের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া লইল। অনার্যের চিত্তে যাহা কেবল রসমাদকতারূপে ছিল আর্য তাহাকে সত্যের মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠ করিয়া দেখিল— তাহা কেবল বিশেষ জাতির বিশেষ একটি পুরাণকথারূপে রহিল না, তাহা সমস্ত মানবের একটি চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্যের রূপকরূপে প্রকাশ পাইল। আর্য এবং দ্রাবিড়ের সম্মিলনে এইরূপে হিন্দুসভ্যতায় সত্যের সহিত রূপের বিচিত্র সম্মিলন ঘটিয়া আসিয়াছে— এইখানে জ্ঞানের সহিত রসের, একের সহিত বিচিত্রের অন্তরতর সংযোগ ঘটিয়াছে।

আর্যসমাজের মূলে পিতৃশাসনতন্ত্র, অনার্যসমাজের মূলে মাতৃশাসনতন্ত্র। এইজন্য বেদে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য নাই। আর্যসমাজে অনার্যপ্রভাবের সঙ্গে এই স্ত্রীদেবতাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিতে লাগিল। তাহা লইয়াও যে সমাজে বিস্তর বিরোধ ঘটিয়াছে, প্রাকৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবীতন্ত্রের মধ্যেও এক দিকে হৈমবতী উমার সুশোভনা আর্যমূর্তি, অন্য দিকে করালী কালিকার কপালমালিনী বিবসনা অনার্যমূর্তি।

কিন্তু সমস্ত অনার্য অনৈক্যকে তাহার সমস্ত কল্পনাকাহিনী আচার ও পূজাপদ্ধতি লইয়া আর্যভাবের ঐক্যসূত্রে আদ্যোপান্ত মিলিত করিয়া তোলা কোনোমতেই সম্ভবপর হয় না— তাহার সমস্তটাকেই রক্ষা করিতে গেলে তাহার মধ্যে শত সহস্র অসংগতি থাকিয়া যায়। এই-সমস্ত অসংগতির কোনোপ্রকার সমন্বয় হয় না— কেবল কালক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায় মাত্র। এই অভ্যাসের মধ্যে অসংগতিগুলি একত্র থাকে, তাহাদের মিলিত করিবার প্রয়োজনবোধও চলিয়া যায়। তখন ধীরে ধীরে এই নীতিই সমাজে প্রবল হইয়া উঠে যে, যাহার যেরূপ শক্তি ও প্রবৃত্তি সে সেইরূপ পূজা আচার লইয়াই থাক্। ইহা একপ্রকার হাল-ছাড়িয়া-দেওয়া নীতি। যখন বিরুদ্ধগুলিকে পাশে রাখিতেই হইবে অথচ কোনোমতেই মিলাইতে পারা যাইবে না, তখন এই কথা ছাড়া অন্য কথা হইতেই পারে না।

এইরূপে বৌদ্ধ যুগের প্রলয়াবসানে বিপর্যস্ত সমাজের নূতন পুরাতন সমস্ত বিচ্ছিন্ন পদার্থ লইয়া ব্রাহ্মণ যেমন করিয়া পারে সেগুলিকে সাজাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বসিল। এমন অবস্থায় স্বভাবতই শৃঙ্খল অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। যাহারা স্বতই স্বতন্ত্র, যাহারা নানা জাতির নানা কালের সামগ্রী, তাহাদিগকে এক করিয়া বাঁধিতে গেলে বাঁধন অত্যন্ত আঁট

করিয়া রাখিতে হয়— তাহারা জীবনধর্মের নিয়ম-অনুসারে আপনার যোগ আপনিই সাধন করে না।

ভারতবর্ষে ইতিহাসের আরম্ভযুগে যখন আর্য-অনার্যে যুদ্ধ চলিতেছিল তখন দুই পক্ষের মধ্যে একটা প্রবল বিরোধ ছিল। এই-প্রকার বিরোধের মধ্যেও এক প্রকারের সমকক্ষতা থাকে। মানুষ যাহার সঙ্গে লড়াই করে তাহাকে তীব্রভাবে দ্বেষ করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে মনের সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে পারে না। এইজন্য ক্ষত্রিয়েরা অনার্যের সহিত যেমন লড়াই করিয়াছে তেমনি তাহাদের সহিত মিলিতও হইয়াছে। মহাভারতে ক্ষত্রিয়দের বিবাহের ফর্দ ধরিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কিন্তু ইতিহাসে পরবর্তী যুগে যখন আর-একদিন অনার্যবিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল অনার্যেরা তখন আর বাহিরে নাই, তাহারা একেবারে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তখন যুদ্ধ করিবার দিন আর নাই। এইজন্য সেই অবস্থায় বিদ্বেষ একান্ত একটা ঘৃণার আকার ধরিয়াছিল। এই ঘৃণাই তখন অস্ত্র। ঘৃণার দ্বারা মানুষকে কেবল যে দূরে ঠেকাইয়া রাখা যায় তাহা নহে, যাহাকে সকল প্রকারে ঘৃণা করা যায় তাহারও মন আপনি খাটো হইয়া আসে; সেও আপনার হীনতার সংকোচে সমাজের মধ্যে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে; যেখানে সে থাকে সেখানে সে কোনোরূপ অধিকার দাবি করে না। এইরূপে যখন সমাজের এক ভাগ আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়াই স্বীকার করিয়া লয় এবং আর-এক ভাগ আপনার আধিপত্যে কোনো বাধাই পায় না— তখন নীচে যে থাকে সে যতই অবনত হয় উপরে যে থাকে সেও ততই নামিয়া পড়িতে থাকে। ভারতবর্ষে আত্ম-প্রসারণের দিনে যে অনার্যবিদ্বেষ ছিল এবং আত্মসংকোচনের দিনে যে অনার্যবিদ্বেষ জাগিল উহার মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ। প্রথম বিদ্বেষের

সমতল-টানে মনুষ্যত্ব খাড়া থাকে, দ্বিতীয় বিদ্বেষের নীচের টানে মনুষ্যত্ব নামিয়া যায়। যাহাকে মারি সে যখন ফিরিয়া মারে তখন মানুষের মঙ্গল, যাহাকে মারি সে যখন নীরবে সে মার মাথা পাতিয়া লয় তখন বড়ো দুর্গতি। বেদে অনার্যদের প্রতি যে বিদ্বেষপ্রকাশ আছে তাহার মধ্যে পৌরুষ দেখিতে পাই, মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি যে একান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞা দেখা যায় তাহার মধ্যে কাপুরুষতারই লক্ষণ ফুটিয়াছে। মানুষের ইতিহাসে সর্বত্রই এইরূপ ঘটে। যেখানেই কোনো-এক পক্ষ সম্পূর্ণ একেশ্বর হয়, যেখানেই তাহার সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ কেহই থাকে না, সেখানেই কেবল বন্ধনের পর বন্ধনের দিন আসে; সেখানেই একেশ্বর প্রভু নিজের প্রতাপকে সকল দিক হইতেই সম্পূর্ণ বাধাহীনরূপে নিরাপদ করিতে গিয়া নিজের প্রতাপই নত করিয়া ফেলে। বস্তুত মানুষ যেখানেই মানুষকে ঘৃণা করিবার অপ্রতিহত অধিকার পায় সেখানে যে মাদক বিষ তাহার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে তেমন নিদারুণ বিষ মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। আর্য ও অনার্য, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, য়ুরোপীয় ও এসিয়াটিক, আমেরিকান ও নিগ্রো, যেখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটে সেখানেই দুই পক্ষের কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত হইয়া মানুষের সর্বনাশকে ঘনাইয়া আনে। বরং শত্রুতা শ্রেয়, কিন্তু ঘৃণা ভয়ংকর।

ব্রাহ্মণ একদিন সমস্ত ভারতবর্ষীয় সমাজের একেশ্বর হইয়া উঠিল এবং সমাজবিধি সকলকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া বাঁধিল। ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসারণের যুগের পর অত্যন্ত সংকোচনের যুগ স্বভাবতই ঘটিল।

বিপদ হইল এই যে, পূর্বে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই শক্তি ছিল। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধতার যোগে সমাজের গতি মধ্যপথে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল; এখন সমাজে সেই ক্ষত্রিয়শক্তি আর কাজ করিল না।

সমাজের অনার্যশক্তি ব্রাহ্মণশক্তির প্রতিযোগীরূপে দাঁড়াইতে পারিল না— ব্রাহ্মণ তাহাকে অবজ্ঞার সহিত স্বীকার করিয়া লইয়া আপন পরাভবের উপরেও জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিল।

এ দিকে বাহির হইতে যে বীর জাতি এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া রাজপুত নামে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত সিংহাসনগুলিই অধিকার করিয়া লইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য অনার্যদের ন্যায় তাহাদিগকেও স্বীকার করিয়া লইয়া একটি কৃত্রিম ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিল। এই ক্ষত্রিয়গণ বুদ্ধিপ্রকৃতিতে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ নহে। ইহারা প্রাচীন আর্য ক্ষত্রিয়দের ন্যায় সমাজের সৃষ্টিকার্যে আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিতে পারে নাই, ইহারা সাহস ও বাহুবল লইয়া ব্রাহ্মণশক্তির সহায় ও অনুবর্তী হইয়া বন্ধনকে দৃঢ় করিবার দিকেই সম্পূর্ণ যোগ দিল।

এরূপ অবস্থায় কখনোই সমাজের ওজন ঠিক থাকিতে পারে না। আত্মপ্রসারের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া একমাত্র আত্মরক্ষীশক্তি সংকোচের দিকেই যখন পাকের পর পাক জড়াইয়া চলে তখন জাতির প্রতিভা স্ফূর্তি পাইতে পারে না। কারণ, সমাজের এই বন্ধন একটা কৃত্রিম পদার্থ; এইরূপ শিকল দিয়া বাঁধার দ্বারা কখনো কলেবর গঠিত হয় না। ইহাতে কেবলই বংশানুক্রমে জাতির মধ্যে কালের ধর্মই জাগে ও জীবনের ধর্মই হ্রাস পায়; এরূপ জাতি চিন্তায় ও কর্মে কর্তৃত্বভাবের অযোগ্য হইয়া পরাধীনতার জন্যই সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আর্য-ইতিহাসের প্রথম যুগে যখন সমাজের অভ্যাসপ্রবণতা বিস্তর বাহিরের জিনিস জমাইয়া তুলিয়া চলিবার পথ বন্ধ করিয়া দিতেছিল তখন সমাজের চিত্তবৃত্তি তাহার মধ্যে দিয়া ঐক্যের পথ সন্ধান করিয়া এই বহুর বাধা হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছিল। আজও সমাজে তেমনি আর-এক দিন

আসিয়াছে। আজ বাহিরের জিনিস আরও অনেক বেশি এবং আরও অনেক অসংগত। তাহা আমাদের জাতির চিত্তকে ভারগ্রস্ত করিয়া দিতেছে। অথচ সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে একমাত্র শক্তি আধিপত্য করিতেছে তাহা রক্ষণীশক্তি। তাহা যা-কিছু আছে তাহাকেই রাখিয়াছে, যাহা ভাঙিয়া পড়িতেছে তাহাকেও জমাইতেছে, যাহা উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে তাহাকেও কুড়াইতেছে। জাতির জীবনের গতিকে এই-সকল অভ্যাসের জড়সঞ্চয় পদে পদে বাধা না দিয়া থাকিতে পারে না; ইহা মানুষের চিন্তাকে সংকীর্ণ ও কর্মকে সংরুদ্ধ করিবেই; সেই দুর্গতি হইতে বাঁচাইবার জন্য এই কালেই সকলের চেয়ে সেই চিত্তশক্তিরই প্রয়োজন হইয়াছে যাহা জটিলতার মধ্য হইতে সরলকে, বাহ্যিকতার মধ্য হইতে অন্তরকে এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্য হইতে এককে বাধামুক্ত করিয়া বাহির করিবে। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই চিত্তশক্তিকেই অপরাধী করিয়া তাহাকে সমাজ হাজার শিকলে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তবু এই বন্ধনজর্জর চিত্ত একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের একান্ত আত্মসংকোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও তাহার আত্মপ্রসারণের উদ্‌বোধনচেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়াছে, ভারতবর্ষের মধ্যযুগে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। নানক কবীর প্রভৃতি গুরুগণ সেই চেষ্টাকেই আকার দিয়াছেন। কবীরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্যসাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে। বিপুল বিক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার মধ্যে ভারত যে কোন্ নিভৃতে, সত্যে, প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা যেন ধ্যানযোগে তিনি সুস্পষ্ট

দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই মধ্যযুগে পরে পরে বারবার সেইরূপ গুরুরই অভ্যুদয় হইয়াছে— তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা এই ছিল, যাহা বোঝা হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই সোজা করিয়া তোলা। ইহারাই লোকাচার শাস্ত্রবিধি ও সমস্ত চিরাভ্যাসের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া সত্য ভারতকে তাহার বাহ্য বেষ্টনের অন্তঃপুরে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

সেই যুগের এখনও অবসান হয় নাই, সেই চেষ্টা এখনও চলিতেছে। এই চেষ্টাকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না; কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীনকাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে; ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধ ধর্ম, সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী; তাহার শ্রীকৃষ্ণ, তাহার শ্রীরামচন্দ্র এই মহাযুদ্ধেরই অধিনায়ক; আমাদের চিরদিনের সেই মুক্তিপ্রিয় ভারতবর্ষ বহুকালের জড়ত্বের নানা বোঝাকে মাথায় লইয়া একই জায়গায় শতাব্দীর পর শতাব্দী নিশ্চল পড়িয়া থাকিবে, ইহা কখনোই তাহার প্রকৃতিগত নহে। ইহা তাহার দেহ নহে, ইহা তাহার জীবনের আনন্দ নহে, ইহা তাহার বাহিরের দায়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায় বলিয়া বাহুল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা। ভারতের অন্তরতম সত্যপ্রকৃতিই ভারতকে এই-সমস্ত নিরর্থক বাহুল্যের ভীষণ বোঝা হইতে বাঁচাইবেই। তাহার ইতিহাস তাহার পথকে যতই অসাধ্যরূপে বাধাসংকুল করিয়া তুলুক-না, তাহার প্রতিভা নিজের শক্তিতে এই পর্বতপ্রমাণ বিঘ্নব্যূহ ভেদ করিয়াই বাহির হইয়া যাইবে— যত বড়ো সমস্যা তত বড়োই তাহার তপস্যা

হইবে। যাহা কালে কালে জমিয়া উঠিয়াছে তাহারই মধ্যে হাল ছাড়িয়া ডুবিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষের চিরদিনের সাধনা এমন করিয়া চিরকালের মতো হার মানিবে না। এরূপ হার মানা যে মৃত্যুর পথ। যাহা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা যদি শুদ্ধমাত্র সেখানে পড়িয়াই থাকিত তবে সে অসুবিধা কোনোমতে সহ্য করা যাইত— কিন্তু তাহাকে যে খোরাকি দিতে হয়। জাতিমাত্রেরই শক্তি পরিমিত— সে এমন কথা যদি বলে যে 'যাহা আছে এবং যাহা আসে সমস্তকেই আমি নির্বিচারে পুষিব', তবে এত রক্তশোষণে তাহার শক্তিক্ষয় না হইয়া থাকিতে পারে না। যে সমাজ নিকৃষ্টকে বহন ও পোষণ করিতেছে উৎকৃষ্টকে সে উপবাসী রাখিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মূঢ়ের জন্য মূঢ়তা, দুর্বলের জন্য দুর্বলতা, অনার্যের জন্য বীভৎসতা সমাজে রক্ষা করা কর্তব্য এ কথা কানে শুনিতে মন্দ লাগে না, কিন্তু জাতির প্রাণভাণ্ডার হইতে যখন তাহার খাদ্য জোগাইতে হয় তখন জাতির যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ প্রত্যহই তাহার ভাগ নষ্ট হয় এবং প্রত্যহই জাতির বুদ্ধি দুর্বল ও বীর্য মৃতপ্রায় হইয়া আসে। নীচের প্রতি যাহা প্রশ্রয় উচ্চের প্রতি তাহাই বঞ্চনা; কখনোই তাহাকে ঔদার্য বলা যাইতে পারে না; ইহাই তামসিকতা, এবং এই তামসিকতা কখনোই ভারতবর্ষের সত্য সামগ্রী নহে।

ঘোরতর দুর্যোগের নিশীথ-অন্ধকারেও এই তামসিকতার মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকে নাই। যে-সমস্ত অদ্ভুত দুঃস্বপ্নভার তাহার বুক চাপিয়া নিশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সরল সত্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিবার জন্য তাহার অভিভূত চৈতন্যও ক্ষণে ক্ষণে একান্ত চেষ্টা করিয়াছে। আজ আমরা যে কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে কালকে বাহির হইতে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে

পাই না ; তবু অনুভব করিতেছি, ভারতবর্ষ আপনার সত্যকে, এককে, সামঞ্জস্যকে ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। নদীতে বাঁধের উপর বাঁধ পড়িয়াছিল, কতকাল হইতে তাহাতে আর স্রোত খেলিতেছিল না, আজ কোথায় তাহার প্রাচীর ভাঙিয়াছে— তাই আজ এই স্থির জলে আবার যেন মহাসমুদ্রের সংস্রব পাইয়াছি, আবার যেন বিশ্বের জোয়ার-ভাঁটার আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে। এখনই দেখা যাইতেছে আমাদের সমস্ত নব্য উদ্‌যোগ সজীবহৃৎপিণ্ডচালিত রক্তস্রোতের মতো একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে একবার আপনার দিকে ফিরিতেছে, একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে একবার স্বাজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে। একবার সে সর্বস্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজস্বকে ছাড়িতে চাহিতেছে, আবার সে দেখিতেছে নিজস্বকে ছাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল নিজস্বই হারানো হয়, সর্বস্বকে পাওয়া যায় না। জীবনের কাজ আরম্ভ হইবার এই তো লক্ষণ। এমনি করিয়া দুই ধাক্কার মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্য পথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়— এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।

শিবাজী ও মারাঠা জাতি

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকি তাহা রাজাদের জীবনবৃত্তান্ত, দেশের ইতিবৃত্ত নহে।

দেশের লোকের সমগ্র চিত্তে যখন কোনো-একটি অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে এবং সর্বসাধারণে সচেষ্ট হইয়া সেই অভিপ্রায়কে সার্থক করিতে চায় ও সেই অভিপ্রায়কে প্রতিকূল আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই সে দেশ যথার্থভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায়।

এইরূপ কোনো-একটি এক-অভিপ্রায়কে লইয়া ভারতবর্ষের কোনো-একটি প্রদেশ আপনাকে একচিত্ত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে, এরূপ অবস্থা ভারতবর্ষের ভাগ্যে অধিক ঘটে নাই।

কোনো দেশের লোক যখন এইরূপে ঐক্য উপলব্ধি করে তখন তাহারা স্বভাবতই সেই উপলব্ধিকে ইতিহাসে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। যে-সকল ঘটনা বিচ্ছিন্ন, যাহা আকস্মিক, দেশের লোকের চিত্তে যাহার কোনো অখণ্ড তাৎপর্য নাই, দেশের লোক তাহাকে সহজেই ইতিহাসরূপে গাঁথিয়া রাখে না, কারণ গাঁথিয়া রাখার কোনো-একটি সূত্র তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে পায় না।

এইজন্য আধুনিক ভারতের রাজকীয় বৃত্তান্ত অধিকাংশই বিদেশীর লেখা। দেশের সাধারণ লোকে এই-সকল বৃত্তান্ত স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য কোনো উৎসাহ বোধ করে নাই।

সমগ্র দেশের কোনো বিশেষ কালের ইতিহাসকে রক্ষা করিবার স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টা দেশের লোকের দ্বারা যদি ভারতবর্ষের কোথাও ঘটিয়া থাকে, সে মহারাষ্ট্র দেশে। মহারাষ্ট্রের 'বখর'গুলি তাহার নিদর্শন।

যে সময় লইয়া এই-সকল জাতীয় ইতিবৃত্ত রচিত হইতেছিল সেই

সময়ে দেশের লোকে যে আপনাদের একটি অঙ্গবদ্ধ স্পষ্টসত্তা অনুভব করিয়াছিল, তাহা এই ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তির দ্বারাই নিশ্চিত সপ্রমাণ হইতেছে।

রাজপুতনাতেও ইতিহাসের টুক্‌রা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা এক-একটি দলের, এক-একটি খণ্ড রাজ্যের ইতিহাস ; সমস্ত রাজপুত জাতির ইতিহাস নহে। কিন্তু মারাঠাদের সম্মিলিত পরিচয় আছে ; তাহা কেবল এক-একটি গোত্রবিশেষের গৌরবকীর্তন নহে।

শিখগুরুদের ইতিহাসের মধ্যে শিখদের জাতীয় ইতিহাস রচিত হইয়াছে, কিন্তু মারাঠার ইতিহাসের মতো এমন ব্যাপক এবং সাঙ্গোপাঙ্গ হইয়া উঠে নাই। শিখের ইতিহাসে বীরত্বের ও মহত্ত্বের অনেক পরিচয় আছে, কিন্তু তাহাতে সুপরিণত রাষ্ট্রগঠনের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। মারাঠারা কেবলমাত্র বীরত্ব করে নাই, তাহারা রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছিল।

অতএব আধুনিক ভারতের যদি কোনো প্রদেশের ইতিহাস থাকে, এবং সেই ইতিহাস হইতে যদি ঐতিহাসিক তত্ত্ব কিছু শিক্ষা করা যাইতে পারে, তবে তাহা মারাঠার ইতিহাস হইতে।

ইংলণ্ডে এক সময়ে বৃটনেরা ছিল— ডেন্‌দের সহিত স্যাক্‌সনদের সহিত তাহাদের লড়াই চলিত। মাঝে হইতে রোমানেরা কিছুদিন তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়া গেল। তাহার পরে নর্মানেরা এই দ্বীপ অধিকার করিয়া লইল। এই-সকল কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ির বৃত্তান্তে ইতিহাসের মূর্তি প্রস্ফুট নহে। কিন্তু ইংলণ্ডে যখন হইতে জাতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল, নানা শক্তির মন্থনে যখন হইতে দেশের চিত্ত সজাগ হইয়া আপনার লক্ষ্য নির্ণয় ও তাহার পথ পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন

হইতে ইংলণ্ডের ইতিহাস যেন দেহ ধারণ করিল এবং এই ইতিহাস মানুষের শিক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল।

ভারতবর্ষেও মোগল-পাঠানে মিলিয়া রক্তবর্ণ নাট্যমঞ্চে যে অভিনয় করিয়া গিয়াছে তাহাতে রসের অভাব নাই, কিন্তু তাহাতে ইতিহাস জমিয়া উঠে নাই। সুতরাং তাহা পড়িয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিক শিক্ষা লাভ হয় না।

ভারতবর্ষে কেবল মারাঠা জাতির ও শিখ জাতির কিছুকালের ইতিহাসে যথার্থ ঐতিহাসিকতা আছে। কী নিয়মে কিসের প্রেরণায় জাতি গড়িয়া উঠে, কিসের শক্তিতে তাহার উন্নতি হয় এবং কিসের অভাবে তাহার পতন ঘটে, ঘরের দৃষ্টান্ত লইয়া যদি কেহ সেই তত্ত্বের আলোচনা ভারতবর্ষে করিতে চায়, তবে কেবলমাত্র মারাঠা ও শিখের ইতিহাস তাহার সম্বল।

অথচ বাংলার বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পড়ানো হয় তাহাতে মোগল-পাঠানের বৃত্তান্ত সকলের চেয়ে বড়ো জায়গা জুড়িয়া আছে; সেই বৃত্তান্ত দেশের লোকের বৃত্তান্ত নহে; সেই বৃত্তান্তে ভারতবর্ষ কেবল উপলক্ষ্য মাত্র; অর্থাৎ ভারতবর্ষ এই বৃত্তান্তের ফ্রেম মাত্র, ছবি নহে। এই বিদেশী রাজাদের কীর্তি-কাহিনীর সংশ্রবে মারাঠা ও শিখের যেটুকু ইতিহাস আমাদের ছাত্রেরা পড়িতে পায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। অথচ আধুনিক ভারতবর্ষের কেবল এই অংশমাত্রেই দেশের লোকের ইতিহাস বলিতে যদি কিছু থাকে তাহা আছে।

প্রায়ই জাতীয় অভ্যুত্থানের মূলে এক বা একাধিক মহাপুরুষ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সেই-সকল মহাপুরুষ আপন শক্তিকে প্রকাশ করিতেই পারিতেন না, যদি দেশের মধ্যে মহৎ ভাবের ব্যাপ্তি না হইত। চারি দিকে আয়োজন অনেক দিন হইতেই হয়;

সেই আয়োজনে ছোটো বড়ো অনেকেরও যোগ থাকে; অবশেষে শক্তিশালী লোক উঠিয়া সেই আয়োজনকে ব্যবহারে প্রয়োগ করেন।

মারাঠার ইতিহাসে আমরা শিবাজীকেই বড়ো করিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু শিবাজী বড়ো হইয়া উঠিতে পারিতেন না, যদি সমস্ত মারাঠা জাতি তাঁহাকে বড়ো করিয়া না তুলিত। বহু দিন হইতে বহু ধর্মবীর দেশের উচ্চ-নীচের, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের কৃত্রিম ব্যবধান ভেদ করিয়া পরস্পরের মধ্যে যোগ-সাধন করিতেছিলেন। ভক্তির রাজপথকে তাঁহারা ইতর ও বিশিষ্ট সকলেরই জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এক ভগবানের অধিকারে তাঁহারা দেশের সকলকে সমান গৌরবের অধিকারী করিয়াছিলেন। মারাঠায় ধর্মান্দোলনে দেশের সমস্ত লোক একত্র মথিত হইতেছিল। শিবাজীর প্রতিভা সেই মন্থন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা সমস্ত দেশের ধর্মোদ্‌বোধনের সহিত জড়িত, এইজন্যই দেশের শক্তিতে তিনি ধন্য ও তাঁহার শক্তিতে দেশ ধন্য হইয়াছে।

যদি এ কথা সত্য হইত যে, শিবাজী প্রতিভাশালী দস্যু মাত্র, তিনি নিজের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতাবিস্তারের জন্য অসামান্য কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার সেই দস্যুতাকে অবলম্বন করিয়া কখনোই সমস্ত মারাঠা জাতি এক হইয়া উঠিত না। বিশেষত, শিবাজী যখন অওরঙ্গজেবের জালে জড়িত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূরে যাপন করিতে হইয়াছিল তখনও যে তাঁহার কীর্তি ভাঙিয়া ভূমিসাৎ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, সমস্ত দেশের ধর্মবুদ্ধির সহিত তাঁহার চেষ্টার যোগ ছিল। বস্তুত, তাঁহার সাধনা সমস্ত দেশেরই ধর্ম-সাধনার একটি বিশেষ প্রকাশ। এই ধর্মসাধনার আহ্বানেই খণ্ড খণ্ড মারাঠা আপনার বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্র সম্মিলিত করিয়া মঙ্গল-উদ্দেশ্যের

নিকট নিবেদন করিতে পারিয়াছিল ; লুণ্ঠনের ভাগ লইয়া, ক্ষমতার ভাগ লইয়া, পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে নাই।

অবশেষে যখন একদিন এই ধর্মসাধনা স্বার্থসাধনে বিকৃত হইয়া গেল, যখন সমস্ত দেশের শক্তি আর একত্র মিলিতে পারিল না, তখন পরস্পর অবিশ্বাস ঈর্ষা বিশ্বাসঘাতকতা বটগাছের কুটিল শিকড়জালের মতো মারাঠা-প্রতাপের বিশাল হর্ম্যকে ভিত্তিতে ভিত্তিতে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া দিল। ধর্ম সমস্ত জাতিকে এক করিয়াছিল, এবং স্বার্থ ই তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে— ইহাই মারাঠা- অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস। ব্যক্তিগত মহাশক্তির সঙ্গে দেশের শক্তিকে মিলাইতে পারে ধর্মের যোগ ; কিন্তু ব্যক্তিগত শক্তি যখন স্বার্থকে অবলম্বন করে তখন সমস্ত দেশের শক্তি কখনোই তাহার সঙ্গে এক হইয়া মিলিতে পারে না।

ধর্মের উদার ঐক্য দেশের ভেদবুদ্ধিকে নিরস্ত করিয়া দিলে তবেই দেশের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি একত্র মিলিত হইয়া অভাবনীয় সফলতা লাভ করে, ইহাই মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের শিক্ষা, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে প্রবল প্রতাপও আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না।

শিবাজী ও গুরু গোবিন্দসিংহ

শিখ-ইতিহাসের সহিত মারাঠা-ইতিহাসের প্রধান প্রভেদ এই যে, যিনি মারাঠা-ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান নায়ক সেই শিবাজী হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে স্থপরিস্ফুট করিয়া লইয়াই ইতিহাসের রঙ্গক্ষেত্রে মারাঠা জাতির অবতারণা করিয়াছিলেন ; তিনি দেশজয় শত্রু-বিনাশ রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি যাহা-কিছু করিয়াছেন সমস্তই ভারতব্যাপী একটি বৃহৎ সংকল্পের অঙ্গ ছিল।

আর, গোড়ায় ধর্মের ইতিহাসরূপে শিখ-ইতিহাসের আরম্ভ হইয়াছিল। বাবা নানক যে স্বাধীনতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে ; যে দেবপূজা কেবল দেশবিশেষের, জাতিবিশেষের কল্পনা ও অভ্যাসের দ্বারা সীমাবদ্ধ, পৃথিবীর সকল মানুষের চিত্ত যাহার মধ্যে অধিকার পায় না এবং বাধা পায়, নানকের ধর্মবুদ্ধি তাহার মধ্যে আপনাকে সংকুচিত করিতে পারে নাই ; এই-সকল সংকীর্ণ পৌরাণিক ধর্মের বন্ধন হইতে তাঁহার হৃদয় মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং সেই মুক্তি তিনি সকলের কাছে প্রচার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

নানকের উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া যাহারা তাঁহার নিকটে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারাই শিখ অর্থাৎ শিষ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

জাতিনির্বিচারে সকলেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিত। অতএব নানকের অনুবর্তীদিগকে লইয়া কোনো জাতিগত ইতিহাস যে গড়িয়া উঠিবে, এরূপ লক্ষণ প্রথমে দেখা যায় নাই।

কিন্তু মোগলদিগের নিকট হইতে অত্যাচার পাইয়া এই নানক-শিষ্যের দল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ে সংহত হইয়া দাঁড়াইল এবং সেই কারণেই সর্বসাধারণের নিকট ধর্মপ্রচার অপেক্ষা আত্মদলকেই বিনাশ ও উপদ্রব হইতে রক্ষা করাই তাহাদের প্রধান চেষ্টা হইল। এইরূপে বাহির হইতে

চাপ পাইয়াই শিখ একটি ঘনিষ্ঠ জাতি হইয়া দাঁড়াইল।

শিখদের যিনি শেষ গুরু ছিলেন এই কাজেই তিনি বিশেষভাবে লাগিলেন। সর্বমানবের মধ্যে ধর্মপ্রচার-কার্যকে সংহৃত করিয়া লইয়া শিখদিগকে বলিষ্ঠ করিয়া তোলাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

এ কাজ প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্রচারকের নহে; ইহা প্রধানত সেনানায়ক এবং রাজনীতিজ্ঞের কাজ। গুরু গোবিন্দের মধ্যে সেই গুণ ছিল। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ে দল বাঁধিয়া তুলিয়া বৈরনির্যাতনের উপযুক্ত যোদ্ধা ছিলেন। তিনিই ধর্মসম্প্রদায়কে বৃহৎ সৈন্যদলে পরিণত করিলেন এবং ধর্মপ্রচারক গুরুর আসনকে শূন্য করিয়া দিলেন।

গুরু নানক যে মুক্তির উপলব্ধিকে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া জানিয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ তাহার প্রতি লক্ষ স্থির রাখিতে পারেন নাই। শত্রুহস্ত হইতে মুক্তিকামনাকেই তিনি তাঁহার শিষ্যদের মনে একান্তভাবে মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

ইহাতে ক্ষণকালের জন্য ইতিহাসে শিখদের পরাক্রম উজ্জ্বল হইয়াছিল সন্দেহ নাই, ইহাতে তাহাদিগকে রণনৈপুণ্য দান করিয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু বাবা নানক যে পাথেয় দিয়া তাহাদিগকে একটি উদার পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই পাথেয় তাহারা এইখানেই খরচ করিয়া ফেলিল এবং তাহাদের যাত্রাও তাহারা এইখানেই অবসান করিয়া দিল।

ইহার পর হইতে কেবল লড়াই এবং রাষ্ট্রবিস্তারের ইতিহাস। এ দিকে মোগল শক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল এবং শিখদল তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যতই কৃতকার্য হইতে লাগিল ততই আত্মরক্ষার চেষ্টা ঘুচিয়া গিয়া ক্ষমতাবিস্তারের লোলুপতা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

যতদিন বিরুদ্ধপক্ষ প্রবল থাকাতে আত্মরক্ষার চেষ্টাই একান্ত হইয়া

উঠে ততদিন এক বিপদের তাড়নায় নিজেদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় থাকে। বাহিরের সেই চাপ সরিয়া গেলে এই বিজয়মদমত্ততাকে কিসে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে? আত্মরক্ষাচেষ্টায় যে যুদ্ধশক্তি সঞ্চিত হইয়া উঠে অন্যকে আঘাত করিবার উদ্যম হইতে নিবৃত্ত করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় সেই শক্তিকে কে নিযুক্ত করিতে পারে?

যে শক্তি তাহা পারিত আশু-প্রয়োজন-সাধনের অতিলোলুপতায় গুরু গোবিন্দ তাহাকে খর্ব করিয়াছিলেন। গুরুর পরিবর্তে তিনি শিখদিগকে তরবারি দান করিলেন। তিনি যখন চলিয়া গেলেন তখন নানকের প্রচারিত মহাসত্য গ্রন্থসাহেবের মধ্যে আবদ্ধ হইল, তাহা গুরু-পরম্পরায় জীবনপ্রবাহে ধাবিত হইয়া মানবসমাজকে ফলবান্ করিবার জন্য অপ্রতিহত গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিল না; এক জায়গায় তাহা অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

শক্তি তখন দেখিতে দেখিতে লুব্ধ এবং অসংযত হইয়া উঠিল। তখন দেবতার তিরোধানে অপদেবতার প্রাদুর্ভাব হইল, কাড়াকাড়ি ও দলাদলি উদ্দাম হইয়া উঠিল।

এই উচ্ছৃঙ্খল আত্মঘাতসাধনের মধ্যে রণজিৎসিংহের অভ্যুদয় হইল। তিনি কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন শিখদিগকে এক করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কেবলমাত্র বলের দ্বারা। তিনি সকলের চেয়ে বলশালী বলিয়া সকলকে দমন করিয়াছিলেন।

বলের দ্বারা যে লোক এক করে সে অন্যকে দুর্বল করিয়াই এক করে; শুধু তাই নয়, ঐক্যের যে চিরন্তন মূলতত্ত্ব প্রেম তাহাকেই পরাস্ত করিয়া পঙ্গু করিয়া নিজের প্রয়োজন সাধন করে। রণজিৎসিংহ স্বার্থপুষ্টির জন্যই সমস্ত শিখকে ছলে-বলে-কৌশলে নিবিড় করিয়া

বাঁধিয়াছিলেন।

শিখ সম্প্রদায়ের চিত্তে তিনি এমন কোনো মহৎ ভাবের সঞ্চার করেন নাই যাহাতে তাঁহার অবর্তমানেও তাহাদিগকে একত্র ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। কেবলমাত্র অপ্রতিহত চাতুরী-প্রভাব এবং স্বার্থসাধন সম্বন্ধে সতর্ক অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়াছিলেন।

তাঁহার লোভের সীমা ছিল না এবং তাঁহার ভোগস্পৃহা অসংযত ছিল। একটিমাত্র তাঁহার প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পাইয়াছিলেন, কিছুতেই তাঁহাকে ঠেকাইতে পারে নাই। একটি-মাত্র স্থানে তিনি আপনার দুর্দম ইচ্ছাকে সংযত করিয়াছিলেন— অত্যন্ত লুব্ধ হইয়াও ভারত-মানচিত্রে তিনি ইংরাজের রক্তগণ্ডীকে লঙ্ঘন করেন নাই, তাঁহার স্বার্থবুদ্ধি এইখানে তাঁহাকে টানিয়া রাখিয়াছিল।

যাহা হউক, তিনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কৃতকার্যতার দৃষ্টান্ত মানুষকে যত বিপদে ফেলিয়াছে এমন আর কিছুতেই না। এই দৃষ্টান্তে মানুষের মঙ্গলবুদ্ধিকে পরাস্ত এবং তাহার লুব্ধ প্রবৃত্তিকে অশান্ত করিয়া তোলে— ইহা অপঘাত মৃত্যুরই পথ।

যাঁহা হইতে শিখ সম্প্রদায় আরম্ভ হইয়াছিল সেই নানক অকৃতকার্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এইজন্য তিনি তাঁহার বণিক্‌পিতার কাছে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। লবণের কারবারে নানক কিরূপ লাভ করিয়াছিলেন সে কথা সকলেরই জানা আছে। তিনি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু যে শক্তিতে জাঠ কৃষকেরা প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া দুঃখকে অবজ্ঞা করিয়া বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল সে শক্তি এই কাণ্ডজ্ঞানহীন অকিঞ্চন তাপসই সঞ্চার করিয়া-ছিলেন।

আর, যে মহারাজ কৃতকার্যতার আদর্শস্থল— শিখদের চিরন্তন শত্রুকে

যিনি দমন করিয়াছিলেন, কোনো পরাভবেই যাঁহার ইচ্ছাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই— এক দিকে মোগলরাজ্যাবসান ও অন্য দিকে ইংরেজ-অভ্যুদয়ের সন্ধ্যাকাশকে যাঁহার আকস্মিক প্রতাপ রক্তরশ্মিতে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি শিখদের মধ্যে কী রাখিয়া গেলেন ? অনৈক্য, অবিশ্বাস, উচ্ছৃঙ্খলতা।

শিখদের যাহারা নায়ক ছিল তাহারা এই কৃতকার্য রাজার দৃষ্টান্তে ইহাই শিখিয়াছিল, জোর যার মুলুক তার। তাহারা ত্যাগ শিখিল না, আত্মসমর্পণ শিখিল না, 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ' এ মন্ত্র ভুলিয়া গেল, অর্থাৎ দীনহীন নানক যে শক্তি-দ্বারা তাহাদিগকে বাঁধিয়াছিলেন, মহাপ্রতাপশালী মহারাজ তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন এবং ইতিহাসের আকাশে শিখ-জ্যোতিষ্ক ক্ষণকালের জন্য জ্বলিয়া ক্ষণকালের মধ্যে নিবিয়া গেল।

আজ শিখের মধ্যে আর কোনো অগ্রসর-গতি নাই। তাহারা একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বাঁধিয়া গেছে ; তাহারা আর বাড়িতেছে না ; তাহাদের মধ্যে বহু শতাব্দকালেও আর কোনো মানবগুরুর আবির্ভাব হইল না— জ্ঞানে ধর্মে কর্মে মানবের ভাণ্ডারে তাহারা কোনো নূতন সম্পদ সঞ্চিত করিল না।

নানক-শিষ্যেরা আজ যুদ্ধ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদল ফৌজে ঢুকিয়া কখনো কাবুলে, কখনো চীনে, কখনো আফ্রিকায় লড়াই করিয়া বেড়াইবে, নানকের ধর্মতেজে উদ্দীপ্ত উত্তর-বংশীয়দের এই পরিণামই যে গৌরবজনক, এমন কথা আমরা মনে করিতে পারি না। মনুষ্যত্বের উদার ক্ষেত্রে তাহারা কেবল বারিকে বসিয়া কুচ-কাওয়াজ করিবে এজন্য নানক জীবন উৎসর্গ করেন নাই।

নানক তাঁহার শিষ্যদিগকে স্বার্থপরতা হইতে, ধর্মবোধের সংকীর্ণতা

হইতে, আধ্যাত্মিক অসাড়তা হইতে মুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন—তিনি তাহাদের মনুষ্যত্বকে বৃহদ্‌ভাবে সার্থক করিতে চাহিয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দ এই শিখদিগকে বিশেষ একটি প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া বাঁধিয়া দিলেন, এবং যাহাতে তাহারা সেই প্রয়োজনকে কিছুতে বিস্মৃত না হয় সেইজন্য তাহাদের নামে বেশে ভূষায় আচারে নানা প্রকারে সেই প্রয়োজনটিকে তাহাদের চিত্তের মধ্যে বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। এইরূপে শিখদের মনুষ্যত্বের উদ্যমধারাকে অন্য সকল দিক হইতে প্রতিহত করিয়া তিনি একটা বিশেষ দিকে প্রবাহিত করিলেন। ইহার দ্বারা একটা প্রয়োজনের ছাঁচের মধ্যে শিখ জাতি বদ্ধ হইয়া শক্ত হইয়া তৈরি হইল।

যখন শিখেরা মুক্ত মানুষ না হইয়া বিশেষ প্রয়োজনযোগ্য মানুষ হইল তখন প্রবল রাজা তাহাদিগকে নিজের প্রয়োজনে লাগাইলেন এবং এইরূপে আজ পর্যন্তও তাহারা প্রবলকর্তৃক বিশেষ প্রয়োজনেই লাগিতেছে। স্পার্টায় গ্রীস যখন নিজের মানবত্বকে বিশেষ প্রয়োজনের অনুসারে সংকুচিত করিয়াছিল তখন সে যুদ্ধ করিতে পারিত বটে, কিন্তু আপনাকে খর্ব করিয়াছিল; কারণ, যুদ্ধ করিতে পারাই মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে। এইরূপে মানুষ আশু প্রয়োজনের জন্য নিজের শ্রেয়কে নষ্ট করে এমন উদাহরণ অনেক আছে, এবং আজ পর্যন্ত এই অদূরদর্শী লুব্ধতার তাড়নায় সকল সমাজেই মনুষ্যবলি চলিতেছে। যে নররক্তপিপাসু অপদেবতা এই বলি গ্রহণ করে সে কখনো সমাজ, কখনো রাষ্ট্র, কখনো ধর্ম এবং কখনো তৎকালপ্রচলিত কোনো-একটা সর্বজনমোহকর নাম ধরিয়া মানুষকে নষ্ট করিয়া থাকে।

শিখ-ইতিহাসের পরিণাম আমার কাছে অত্যন্ত শোকাবহ ঠেকে।

যে নদী সমুদ্রে যাইবে বলিয়া অভ্রভেদী পর্বতের পবিত্র শুভ্রশিখর হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল সে যখন পথের মধ্যে বালুকারাশির অভ্যন্তরে লুপ্ত হইয়া তাহার গতি হারায়, তাহার গান ভুলিয়া যায়, তখন সেই ব্যর্থতা যেমন শোচনীয়, তেমনি ভক্তের হৃদয় হইতে যে শুভ্র নির্মল শক্তিধারা বিশ্বকে পবিত্র ও উর্বর করিতে বাহির হইয়াছিল আজ তাহা যখন সৈন্যের বারিকে রক্তবর্ণ পঙ্কের মধ্যে পরিশোষিত হইয়া গেল তখন মানুষ ইহার মধ্যে কোনো গৌরব বা আনন্দ অনুভব করিতে পারে না।

এই শিখ-ইতিহাস একদিন প্রতিজিঘাংসা অথবা অন্য কোনো সংকীর্ণ অভিপ্রায়ের আকর্ষণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মানবসফলতার ক্ষেত্র হইতে স্খলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা নিম্নতর যে জাতীয় সফলতার ক্ষেত্র সেখানেও কোনো গৌরবলাভ করিতে পারে নাই। রণজিৎসিংহ যে রাজ্য বাঁধিয়াছিলেন তাহা রণজিৎসিংহেরই রাজ্য, গোবিন্দসিংহ মোগলদের সঙ্গে যে সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহা কেবলমাত্র শিখ সম্প্রদায়েরই সংগ্রাম। নিজের শিষ্যদলের বাহিরে তিনি সংকল্পকে প্রসারিত করেন নাই।

এইখানে মারাঠা-ইতিহাসের সঙ্গে শিখ-ইতিহাসের প্রভেদ লক্ষিত হয়। শিবাজী যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা কোনো ক্ষুদ্র দলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাহার প্রধান কারণ, তিনি যে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্মকে মুসলমান-শাসন হইতে মুক্তিদান করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা আয়তনে শিখ জাতি ও ধর্ম অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক, সুতরাং সমগ্র ভারতের ইতিহাসকেই নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাই তাঁহার লক্ষের বিষয় ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই।

গুরু গোবিন্দ এবং শিবাজী উভয়েই প্রায় সমসাময়িক। তখন আকবরের উদার রাষ্ট্রনীতির অবসান হইয়াছিল এবং সেইজন্যই মোগল-

শাসন তখন ভারতবর্ষের অমুসলমান ধর্ম ও সমাজকে আত্মরক্ষায় জাগরূক করিয়া তুলিয়াছিল।

বস্তুত তখন ভিতরে বাহিরে আঘাত পাইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে নানা স্থানেই একটা যেন ধর্মচেষ্টার উদ্‌বোধন হইয়াছিল। হিন্দুধর্মসমাজে তখন যে-একটি জীবনচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যে তাহা নানা সাধুভক্তকে আশ্রয় করিয়া নব নব ধর্মোৎসাহে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেইরূপ সচেতন অবস্থায় ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে শিবাজীর ন্যায় বীরপুরুষ-যে ভারতবর্ষে স্বধর্মকে জয়যুক্ত করিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করিবেন, ইহা স্বাভাবিক।

আবার ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে এই সময়ে নবভাবোদ্দীপ্ত শিখধর্মের প্রভাবে শিখ সম্প্রদায়ের চিত্ত ও প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কারণেই মোগল-শাসনের পীড়ন তাহাকে দমন করিতে পারে নাই, বরঞ্চ তাড়নাপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তাহাকে উদ্যত করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু যদিচ ভিতরকার প্রভাব ও বাহিরের আঘাত উভয়েরই পক্ষে একই-রকম ছিল, তথাপি তাহার ক্রিয়া গুরু গোবিন্দ এবং শিবাজীর মধ্যে এক ভাবে প্রকাশ পায় নাই।

গুরু গোবিন্দ মোগলদের সঙ্গে অনেক লড়াই করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কেমন খাপছাড়া-মতো। প্রতিহিংসা এবং আত্মরক্ষা -সাধনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু শিবাজী যে-সকল যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা সোপানপরম্পরার মতো; তাহা রাগারাগি লড়ালড়ি মাত্র নহে। তাহা সমস্ত ভারতবর্ষকে এবং দূর কালকে লক্ষ্য করিয়া একটি বৃহৎ আয়োজন বিস্তার করিতেছিল, তাহার মধ্যে একটি বিপুল আনুপূর্বিকতা ছিল।

তাহা কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রকাশ নহে, তাহা একটি বৃহৎ অভিপ্রায়-সাধনের উদ্‌যোগ।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যাইতেছে, শিখ ও মারাঠা উভয় জাতিরই ইতিহাস একই সময়ে একই প্রকার ব্যর্থতার মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে।

ইহার কারণ কী? কারণ এই যে, যে উদ্দেশ্য সমস্ত দেশকে অধিকার করিতে চাহে তাহা কেবল একজন বা কয়েকজন মাত্র মনস্বী লোককে আশ্রয় করিয়া সফল হইতে পারে না। স্ফুলিঙ্গকে শিখা করিয়া তুলিতে হইলে কেবল প্রবল শক্তিতে চক্‌মকি ঠুকিলেই চলে না, উপযুক্ত পলিতারও আবশ্যক হয়। শিবাজীর চিত্ত সমস্ত দেশের লোকের সহিত আপনার যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। এইজন্য শিবাজীর অভিপ্রায় যাহাই থাক্‌-না, তাঁহার চেষ্টা সমস্ত দেশের চেষ্টারূপে জাগ্রত হইতে পারে নাই। এইজন্যই মারাঠার এই উদ্‌যোগ পরিণামে ভারতের অন্যান্য জাতির পক্ষে বর্গীর উপদ্রব-রূপে নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছিল।

যে মঙ্গল সকলের তাহাকে সকলের চিত্তের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠিত না করা হয়, যদি তাহা কেবল আমার বা আমার দলের কয়েক জনের মধ্যেই বদ্ধ থাকে, তবে তাহার মঙ্গলরূপ ঘুচিয়া যায় এবং অন্যের পক্ষে ক্রমে তাহা উৎপাত হইয়া উঠে।

শিবাজীর মনে যাহা বিশুদ্ধ ছিল, পেশওয়াদের মধ্যে তাহা ক্রমে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা-রূপে কলুষিত হইয়া উঠিল। এমন বিকার কদাচ ঘটিত না যদি এই ভাবটি দেশের সর্বসাধারণের মনে প্রসারিত হইবার পথ প্রশস্ত থাকিত। তাহা হইলে বৃহৎ আধারের মধ্যে বৃহৎ ভাব আপনার স্থান এবং খাদ্য পাইত; তাহা হইলে একটা কাঠ যখন নিবিবার মতো হইত তখন কোথা হইতে আর-একটা কাঠ আপনি জ্বলিয়া উঠিত।

আমাদের দেশে বারম্বার ইহাই দেখা গিয়াছে যে, এখানে শক্তির উদ্‌ভব হয় কিন্তু তাহার ধারাবাহিকতা থাকে না। মহাপুরুষেরা আসেন এবং তাঁহারা চলিয়া যান— তাঁহাদের আবির্ভাবকে ধারণ করিবার, পালন করিবার, তাহাকে পূর্ণ পরিণত করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক সুযোগ এখানে নাই।

ইহার কারণ আমাদের বিচ্ছিন্নতা। যে মাটিতে আঠা একেবারেই নাই সেখানেও বায়ুর বেগে বা পাখির মুখে বীজ আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাহা অঙ্কুরিত হয় না, অথবা দু-চারটি পাতা বাহির হইয়া মুষ্‌ড়িয়া যায়। কারণ, সেখানকার আলগা মাটি রস ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার আর অন্ত নাই ; ধর্মে কর্মে, আহারে বিহারে, আদানে প্রদানে সর্বত্রই বিচ্ছিন্নতা। এইজন্য ভাবের বন্যা নামে, কিন্তু বালুর মধ্যে শুষিয়া যায় ; তেজের স্ফুলিঙ্গ পড়ে, কিন্তু ইতস্তত সামান্য ধোঁওয়া জাগাইয়া নিবিয়া যায়। এইজন্য মহৎ চেষ্টা বৃহৎ চেষ্টা হইয়া উঠে না এবং মহাপুরুষ দেশের সর্বসাধারণের অক্ষমতাকে সমুজ্জ্বল ভাবে সপ্রমাণ করিয়া নির্বাণ লাভ করেন।

যাহা হউক, মারাঠা ও শিখের অভ্যুত্থান ও পতনের কারণ সম্বন্ধে তুলনা করিয়া বলিতে হইলে এই বলা যায় যে, শিখ একদা একটি অত্যন্ত বৃহৎ ভাবের আহ্বানে একত্র হইয়াছিল— এমন একটি সত্যধর্মের বার্তা তাহারা শুনিয়াছিল যাহা কোনো স্থানবিশেষের চিরাগত প্রথার মধ্যে বদ্ধ নহে এবং যাহা কোনো সময়বিশেষের উত্তেজনা হইতে প্রসূত হয় নাই— যাহা চিরকালের এবং সকল মানবের, যাহা ছোটো বড়ো সকলেরই অধিকারকে প্রশস্ত করে, চিত্তকে মুক্তি দেয় এবং যাহাকে স্বীকার

করিলে প্রত্যেক মানুষই মনুষ্যত্বের পূর্ণতম গৌরবকে উপলব্ধি করে। নানকের এই উদার ধর্মের আহ্বানে বহু শতাব্দী ধরিয়া শিখ বহু দুঃখ সহ্য করিয়া ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছিল। এই ধর্মবোধ ও দুঃখভোগের গৌরবে শিখদের মধ্যে অলক্ষ্যে একটি মহৎ ঐক্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

গুরু গোবিন্দ শিখদের এই ধর্মবোধের ঐক্যানুভূতিকে কর্মসাধনার সুযোগে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তিনি একটি বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্মসমাজের ঐক্যকে রাষ্ট্রীয় উন্নতি-লাভের উপায়রূপে খর্ব করিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে সম্প্রদায়কে সংকীর্ণ করিয়া লইয়া তিনি তাহার ঐক্যকে ঘনিষ্ঠ করিয়া লইলেন; যে জাতিভেদ তাহার প্রবল অন্তরায় ছিল তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিলেন।

গুরু গোবিন্দ তাঁহার শিষ্যসমাজের মধ্য হইতে এই-যে ভেদবিভাগকে এক কথায় দূর করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, নানকের উদার ধর্মের প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধির ব্যবধান আপনিই তলে তলে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। গুরু গোবিন্দ তাহাকে আঘাত করিবামাত্র তাহা শতখণ্ড হইয়া পড়িয়া গেল। পূর্ব হইতে গভীরতররূপে যদি ইহার আয়োজন না থাকিত তবে সহস্র প্রয়োজন হইলেও গুরু গোবিন্দ কিছুই করিতে পারিতেন না। শুধু তাহাই নয়, সকলকর্মনাশা এই ভেদকে দূর করিতে হইবে এই সংকল্পমাত্রও তাঁহার মনে আকার গ্রহণ করিতে পারিত না।

কিন্তু গুরু গোবিন্দ কী করিলেন? ঐক্যকেই পাকা করিলেন, অথচ যে মহাভাবের শক্তির সহায়তায় তাহা করা সম্ভব হইল তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, অন্তত তাহার সিংহাসনে আর-একজন প্রবল

শরিক বসাইয়া দিলেন।

ঐক্যই ভাবের বাহন। এই কারণে মহৎ ভাব মাত্রই সেই বাহনকে সৃষ্টি করিবার জন্য আপনার শক্তিকে নিযুক্ত করে। বাহনের গৌরব তাহার আরোহীর মাহাত্ম্যে। গুরু গোবিন্দ সাময়িক ক্রোধের উত্তেজনায় ও প্রয়োজন-বোধে বাহনকে প্রবল করিয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু আরোহীকে খর্ব করিয়া দিলেন।

তাহা হইতে ফল এই হইল, উপস্থিতমত কিছু কিছু কার্যসিদ্ধি ঘটিল, কিন্তু যাহা মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহা বন্ধনে পড়িল; শিখদের মধ্যে পরস্পরকে নিবিড় করিবার ব্যবস্থা রহিল, কিন্তু অগ্রসর করিয়া দিবার বেগ রহিল না। এইজন্য বহু শতাব্দী ধরিয়া যে শিখ পরম গৌরবে মানুষ হইবার দিকে চলিয়াছিল তাহারা হঠাৎ এক সময়ে থামিয়া সৈন্য হইয়া উঠিল— এবং ঐখানেই তাহাদের ইতিহাস শেষ হইয়া গেল।

শিবাজী যে উদ্দেশ্য-সাধনে তাঁহার জীবন প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা কোনো সংকীর্ণ সাময়িক প্রয়োজন-মূলক ছিল না এবং পূর্ব হইতেই দাক্ষিণাত্যের ধর্মগুরুদের প্রভাবে তাঁহার ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত হইয়াছিল। এইজন্য তাঁহার উৎসাহ কিছুকালের জন্য যেন সমস্ত মারাঠা জাতির মধ্যেই সঞ্চারিত হইতে পারিয়াছিল।

ফুটা পাত্রে জল ভরিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু তাহাতে জল থাকে না। ক্ষণকালের ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে মনে হয় সমস্ত বুঝি ছাপাইয়া এক হইয়া গেল, কিন্তু ছিদ্রের কাজ ভিতরে ভিতরে চলিতে থাকে। ভারতবর্ষের সমাজ ছিদ্রে পূর্ণ, কোনো ভাবকে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারে না, এই-জন্য সমাজে প্রাণময় ভাবের পরিবর্তে শুষ্ক নির্জীব আচারের এমন নিদারুণ প্রাদুর্ভাব।

শিবাজী তাঁহার সমসাময়িক মারাঠা-হিন্দু সমাজে একটা প্রবল ভাবের প্রবর্তন এতটা পর্যন্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অভাবেও কিছুদিন পর্যন্ত তাহার বেগ নিঃশেষিত হয় নাই। কিন্তু শিবাজী সেই ভাবের আধারটিকে পাকা করিয়া তুলিতে পারেন নাই, এমন-কি চেষ্টামাত্র করেন নাই। সমাজের বড়ো বড়ো ছিদ্রগুলির দিকে না তাকাইয়া তাহাকে লইয়া ক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। তখনই পাড়ি না দিলে নয় বলিয়া এবং পাড়ি দিবার আর-কোনো উপায় ছিল না বলিয়াই যে অগত্যা এই কাজ করিয়াছেন তাহা নহে। এই ছিদ্রকেই পার করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। শিবাজী যে হিন্দু-সমাজকে মোগল-আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচারবিচারগত বিভাগ-বিচ্ছেদ সেই সমাজেরই একেবারে মূলের জিনিস। সেই বিভাগমূলক ধর্মসমাজকেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বালির বাঁধ বাঁধা, ইহাই অসাধ্য-সাধন।

শিবাজী এমন কোনো ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই যাহা হিন্দু সমাজের মূলগত ছিদ্রগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে। নিজের ধর্ম বাহির হইতে পীড়িত অপমানিত হইতেছে এই ক্ষোভ মনে লইয়া তাহাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিজয়ী করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক হইলেও তাহা সফল হইবার নহে; কারণ, ধর্ম যেখানে ভিতর হইতেই পীড়িত হইতেছে, যেখানে তাহার ভিতরই এমন-সকল বাধা আছে যাহাতে মানুষকে কেবলই বিচ্ছিন্ন ও অপমানিত করিতেছে, সেখানে সে দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া, এমন-কি সেই ভেদবুদ্ধিকেই মুখ্যত ধর্মবুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া, সেই শতদীর্ণ ধর্মসমাজের স্বারাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোনো মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে; কারণ, তাহা বিধাতার বিধানসংগত হইতে পারে না।

কেবল আঘাত পাইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, অভিমান করিয়া, কোনো জাতি বড়ো হইতে, জয়ী হইতে পারে না— যতক্ষণ তাহার ধর্মবুদ্ধির মধ্যেই অখণ্ডতার তত্ত্ব কাজ করিবার স্থান না পায়, যতক্ষণ মিলনের শক্তি কোনো মহৎ ভাবের অমৃতরসে চিরসঞ্জীবিত হইয়া সকল দিক দিয়াই অন্তরে বাহিরে তাহাকে এক করিবার অভিমুখে না লইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের কোনো আঘাতে ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিবিশেষের কোনো বীরত্বেই তাহাকে দৃঢ়ঘনিষ্ঠ, তাহাকে সজীবসচেতন করিয়া তুলিতে পারে না।

আমি অন্যত্র এ কথার আলোচনা করিয়াছি যে ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। কেন নহে তাহার কারণ আছে।

প্রত্যেক জাতির একটি-একটি সাধনার বিষয় আছে। সেই মূলগত সাধনটি লইয়াই সেই জাতির সকল লোক আঁট বাঁধে। নর্মানে স্যাক্সনে মিলিয়া ইংরেজ যখন এক হইয়া গেল, যখন তাহাদের মধ্যে সমাজভেদ রহিল না, তখন তাহাদের মধ্যে একটা বড়ো ভেদ রহিল— রাজার সঙ্গে প্রজার স্বার্থের ভেদ। সেই ভেদ যখন একান্ত থাকে তখন রাজার খেয়ালের জন্য প্রজাদের দুঃখ ও ক্ষতি হইতে থাকে। সেই ভেদ বিলুপ্ত করিয়া রাজ-শক্তিতে নানাপ্রকার বাঁধ বাঁধিয়া পরস্পরের সামঞ্জস্য-সাধনের ইতিহাসই ইংলণ্ডের ইতিহাস। অর্থাৎ, ইংলণ্ডের যে সমস্যা প্রধান ছিল সেই সমস্যার সমাধান লইয়াই তাহার ইতিহাসের পরিণতি ঘটিয়াছে।

ইংরেজি ইস্কুলের ছাত্র ভারতের ইতিহাসে সেই রাষ্ট্রীয় ধারার পথই খুঁজিতে থাকে। খুঁজিয়া না পাইলে বলে ভারতের ইতিহাস নাই। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার ভারতের ইতিহাস সেখানেই ভারতের সমস্যা যেখানে।

প্রত্যেক জাতির সমস্যা সেখানেই, যেখানে তাহার অসামঞ্জস্য। যাহারা বাহিরে পাশাপাশি আছে অন্তরে তাহাদিগকে মিলিতেই হইবে। এই মিলন-চেষ্টাই মানুষের ধর্ম, এই মিলনেই মানুষের সকল দিকে কল্যাণ। সভ্যতাই এই মিলন।

আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজায় প্রজায় ছিল না, সে ছিল এক জাতি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতি-সম্প্রদায়ের। এই-সকল নানা উপজাতির বর্ণ ভাষা আচার ধর্ম চরিত্রের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অথচ ইহারা সকলেই প্রতিবেশী। ইহাতে এক দিকে যেমন পরস্পরের লড়াই

চলিতেছিল তেমনি আর-এক দিকে পরস্পরের সমাজ ও ধর্মের সামঞ্জস্য-সাধন-চেষ্টারও বিশ্রাম ছিল না। কী করিলে পরস্পরে মিলিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া উঠে, অথচ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না হয়, এই দুঃসাধ্য-সাধনের প্রয়াস বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহার সমাধান হয় নাই।

য়ুনাইটেড স্টেট্‌সের ইতিহাসে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহার সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের কিছু মিল আছে, কিন্তু অমিলও যথেষ্ট। সেখানে য়ুরোপের নানা স্থান হইতে নানা জাতি মিলিতেছে। কিন্তু তাহারা একই বর্ণের, সুতরাং তাহাদের মিলনের বাধা সুগভীর নহে। তাহা ছাড়া, য়ুরোপের সকল উপজাতির মধ্যে সভ্যতার রূপভেদ নাই। নিগ্রোদের সমস্যার কোনো ভালো মীমাংসা আজ পর্যন্ত সেখানে হয় নাই বলিয়া কেবলই দুঃখ অত্যাচার অবিচারের সৃষ্টি হইতেছে, ইহাতেই মনুষ্যত্বের পীড়া ঘটে। এই পীড়া দুর্বল সবল উভয়কেই স্পর্শ করে। তাহা ছাড়া এসিয়াবাসীদের সম্বন্ধে শুধু আমেরিকায় নহে য়ুরোপের সকল উপনিবেশেই বিরোধ চলিতেছে। এসিয়াবাসীকে একেবারে নির্বাসিত করিয়া রাখিলে এই বিরোধ দেশের বাহিরে গিয়া কালক্রমে আরো প্রবল হইয়া জমিতে থাকিবে এবং একদিন ইহার হিসাব-নিকাশ করিতেই হইবে। আমেরিকার ইতিহাসে আর-একটা ব্যাপার দেখিতে পাই, তাহাকে ঐক্যসাধন না বলিয়া একাকারীকরণ বলা যায়। যে-কোনো জাতীয় লোক আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে আসে ভাষায় আচারে ব্যবহারে তাহাকে সম্পূর্ণই আমেরিকান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে রাষ্ট্রীয় দিক হইতে সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্যমূলক মানবসভ্যতার দিক হইতে ইহাতে ক্ষতিই ঘটে। সৃষ্টিতত্ত্বে যে পরিণতিক্রিয়া দেখি তাহাতে একাকারত্ব আরম্ভে দেখা যায়,

কিন্তু বিকাশসাধনের সঙ্গে সঙ্গে একের মধ্যে বিভাগ ও সেই বিভাগের মধ্যে ঐক্য প্রকাশ হইতে থাকে। যদি রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পক্ষে একাকারত্বই একান্ত আবশ্যক বলিয়া ধরা হয় তবে বলিতেই হইবে, রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঐক্যের আদর্শ নহে। ইহাতে একপ্রকার স্বাধীনতার লোভে মানুষের গভীরতর স্বাধীনতাকে বলপূর্বক বলি দেওয়া হয়। সমস্যার ইহা প্রকৃত সমাধান নহে বলিয়াই ইহাতে জগতে এত নিগূঢ় দাসত্ব ও ব্যাপক দুঃখের সৃষ্টি হইতেছে।

ভারতবর্ষে নানা জাতির এই সংঘাত ও সামঞ্জস্যের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় বৈদিকযুগ বৌদ্ধযুগে, বৌদ্ধযুগ পৌরাণিক যুগে পরিণত হইয়াছে। এই সৃষ্টির উদ্যমে রাজা ও রাষ্ট্রনীতি প্রধান শক্তি নহে। অবশ্য, বিদেশী রাজা যখন হইতে ভারতে আসিয়াছে তখন হইতে এই স্বাভাবিক সৃষ্টিকার্য বাধা পাওয়ায় আর-একটি অসামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে। এইজন্যই ইংরেজ যাহাকে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করে ভারতে সেই ইতিহাস মুসলমান-অধিকারের পরে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার অর্থ এমন নহে যে বিদেশী রাজত্বের পর হইতে ভারত-ইতিহাসের প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পর্যন্ত বলা যায় যে পূর্বের চেয়ে আমাদের ইতিহাস জটিল হইয়াছে, আমাদের দুরূহ সমস্যায় আরো একটি নূতন গ্রন্থি পড়িয়াছে। এখনো আমাদের মধ্যে ভেদের সমস্যা। এই ভেদ সমাজের ভিতরে থাকাতেই অন্যদেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে কিছুতেই ঠিকমত খাটিতেছে না। আমরা অন্য দেশের নকলে যে-সব পন্থা অবলম্বন করিতেছি, বারম্বার তাহা ব্যর্থ হইতেছে।

যাহাই হউক, আমাদের দেশের এই সামাজিক ইতিহাসের ধারা এখনো আমরা আগাগোড়া অনুসরণ করিয়া দেখি নাই; অনেকটাই অস্পষ্ট আছে

এবং অনেক জায়গাতেই ফাঁক পড়িয়াছে। বিশেষত, যেহেতু আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক এবং ধর্মতন্ত্রমূলক সেইজন্যই আমাদের নিজেদের আজন্মকালীন সামাজিক সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস কুয়াশার মতো আমাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সত্যকে নিরপেক্ষভাবে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে বাধা দিতেছে। যেটুকু গোচর হইয়া উঠিতেছে তাহা বিদেশী ঐতিহাসিকদেরই চেষ্টায়।

কিন্তু নিজের দেশের ইতিহাসের জন্য চিরদিনই কি এমন করিয়া পরের মুখ তাকাইয়া থাকা চলিবে?

বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। ইহা আর্য-ভারতবর্ষ ও হিন্দু-ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। বৌদ্ধযুগে সেই-সকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি একধর্মবন্যায় ভাঙিয়াছিল— শুধু তাই নয়, বাহিরের নানা জাতি এই ধর্মের আহ্বানে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল। তার পরে এই মিশ্রণকে যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া করিয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলিয়াছে। বৈদিকযুগ এবং হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য আছে তাহার মাঝখানের সন্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ। এই যুগে আর্য ও অনার্য এক গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে উভয়ের মানসপ্রকৃতি ও বাহ্য আচারের মধ্যে আদানপ্রদান ও রফানিষ্পত্তির চেষ্টা হইতে থাকে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন; তাই সকল দিকেই বেশ সুসংগত রকমে রফা হইয়া গিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। আভ্যন্তরিক নানা অসংগতির জন্য আমরা অন্তরে বাহিরে দুর্বল রহিয়াছি; সামাজিক ব্যবহারে এবং ধর্মবিশ্বাসে পদে পদেই বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ করিয়া আমাদিগকে

চলিতে হয়— যাহা-কিছু আছে তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা মিলাইয়া লওয়া নহে, অভ্যাসের দ্বারা মানিয়া লওয়াই আমরা প্রধানত আশ্রয় করিয়াছি।

যাহাই হউক, আমাদের এই বর্তমান যুগকে যদি ঠিকমত চিনিতে হয় তবে পূর্ববর্তী সন্ধিযুগের সঙ্গে আমাদের ভালোরূপ পরিচয় হওয়া চাই। একটা কারণে আমাদের দেশে এই পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের যে সম্প্রদায়ের রূপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা হীনযান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধ-ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধ-ধর্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। সেইজন্য মানব-ইতিহাসের সৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়ই প্রধানতর। শ্যাম চীন জাপান জাভা প্রভৃতি দেশে এই মহাযান সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এইজন্যই মহাযান সম্প্রদায় এমন একটা প্রণালীর মতো হইয়াছিল যাহার ভিতর দিয়া নানা জাতির নানা ক্রিয়াকর্ম মন্ত্রতন্ত্র পূজার্চনা ভারতে প্রবাহিত এবং এক মন্থনদণ্ডের দ্বারা মথিত হইয়াছে।

এই মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলিকে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের পুরাণগুলির সঙ্গে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্যের কিছু অংশ বৌদ্ধধর্মের নিজেরই বিশুদ্ধ স্বরূপ-গত, কিন্তু অনেকটা ভারতের অবৈদিক সমাজের সহিত মিশ্রণ-জনিত। এই মিশ্রণের উপাদানগুলি নূতন নহে ; ইহারাও অনেক কালের পুরাতন, মানবের শিশুকালের সৃষ্টি। দিনের বেলায় যেমন তারা দেখা যায় না তেমনি বৈদিক কালের সাহিত্যে এগুলি প্রকাশ পায় নাই, দেশের মধ্যে ইহারা ছড়ানো ছিল। বৌদ্ধযুগে যখন নানা জাতির সম্মিশ্রণ হইল তখন ক্রমশ ইহাদের প্রভাব জাগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধযুগের শেষভাগে ইহারাই

আর-সমস্তকে ঠেলিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা করিবার চেষ্টা, যাহা নিতান্ত অনার্য তাহাকে আর্যবেশ পরাইবার প্রয়াস, ইহাই হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক সাধনা।

অতএব, ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের ধারা যাঁহারা অনুসরণ করিতে চান তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া এই মহাযান বৌদ্ধপুরাণসকলের অনুশীলন করিতে হইবে।...

কাজের লোক কে

আজ প্রায় চার-শো বৎসর হইল পঞ্জাবে তলবন্দী গ্রামে কালু বলিয়া একজন ক্ষত্রিয় ব্যাবসা-বাণিজ্য করিয়া খাইত। তাহার এক ছেলে নানক। নানক কিছু নিতান্ত ছেলেমানুষ নহে। তাহার বয়স হইয়াছে, এখন কোথায় সে বাপের ব্যাবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করিবে তাহা নহে— সে আপনার ভাবনা লইয়া দিন কাটায়, সে ধর্মের কথা লইয়াই থাকে।

কিন্তু বাপের মন টাকার দিকে, ছেলের মন ধর্মের দিকে— সুতরাং বাপের বিশ্বাস হইল এ ছেলেটার দ্বারা পৃথিবীর কোনো কাজ হইবে না। ছেলের দুর্দশার কথা ভাবিয়া কালুর রাত্রে ঘুম হইত না। নানকেরও যে রাত্রে ভালো ঘুম হইত তাহা নহে, তাহারও দিনরাত্রি একটা ভাবনা লাগিয়া ছিল।

বাবা যদিও বলিতেন ছেলের কিছু হইবে না, কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাহা বলিত না। তাহার একটা কারণ বোধ করি এই হইবে যে, নানকের ধর্মে মন থাকাতে পাড়ার লোকের বাণিজ্য-ব্যাবসার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু বোধ করি তাহারা নানকের চেহারা, নানকের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিল। এমন-কি নানকের নামে একটা গল্প রাষ্ট্র আছে। গল্পটা যে সত্য নয় সে আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তবে, লোকে যেরূপ বলে তাহাই লিখিতেছি। একদিন নানক মাঠে গোরু চরাইতে গিয়া গাছের তলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সূর্য অস্ত যাইবার সময় নানকের মুখে রোদ লাগিতেছিল। শুনা যায় নাকি একটা কালো সাপ নানকের মুখের উপর ফণা ধরিয়া রোদ আড়াল করিয়াছিল। সে দেশের রাজা সে সময়ে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা রাজার

নিজের মুখে এ কথা শুনি নাই, নানকও কখনো এ গল্প করেন নাই, এবং এমন পরোপকারী সাপের কথাও কখনো শুনি নাই— শুনিলেও বড়ো বিশ্বাস হয় না।

কালু অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, নানক যদি নিজের হাতে ব্যাবসা আরম্ভ করেন তবে ক্রমে কাজের লোক হইয়া উঠিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি নানকের হাতে কিছু টাকা দিলেন; বলিয়া দিলেন, 'এক গাঁয়ে লুন কিনিয়া আর-এক গাঁয়ে বিক্রয় করিয়া আইস।' নানক টাকা লইয়া বালসিন্ধু চাকরকে সঙ্গে করিয়া লুন কিনিতে গেলেন। এমন সময়ে পথের মধ্যে কতকগুলি ফকিরের সঙ্গে নানকের দেখা হইল। নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন, এই ফকিরদের কাছে ধর্মের বিষয় জানিয়া লইবেন। কিন্তু কাছে গিয়া যখন তাহাদিগকে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তাহারা কথার উত্তর দিতে পারে না। তিন দিন তাহারা খাইতে পায় নাই, এমনি দুর্বল হইয়া গিয়াছে যে মুখ দিয়া কথা সরে না। নানকের মনে বড়ো দয়া হইল। তিনি কাতর হইয়া তাঁহার চাকরকে বলিলেন, 'আমার বাপ কিছু লাভের জন্য আমাকে লুনের ব্যাবসা করিতে হুকুম করিয়াছেন। কিন্তু এ লাভের টাকা কতদিনই বা থাকিবে! দুই দিনেই ফুরাইয়া যাইবে। আমার বড়ো ইচ্ছা হইতেছে, এই টাকায় এই গরিবদের দুঃখ মোচন করিয়া যে লাভ চিরদিন থাকিবে সেই পুণ্য লাভ করি।' বালসিন্ধু কাজের লোক ছিল বটে, কিন্তু নানকের কথা শুনিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। সে কহিল, 'এ বড়ো ভালো কথা।' নানক তাঁহার ব্যাবসার সমস্ত টাকা ফকিরদের দান করিলেন। তাহারা পেট ভরিয়া খাইয়া যখন গায়ে জোর পাইল তখন নানককে ডাকিয়া ঈশ্বরের কথা শুনাইল। তাহারা নানককে বুঝাইয়া

দিল, ঈশ্বর কেবল একমাত্র আছেন আর সমস্ত তাঁহারই সৃষ্টি। এই-সকল কথা শুনিয়া নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল।

তাহার পরদিন নানক বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। কালু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত লাভ করিলে?' নানক বলিল, 'বাবা, আমি গরিবদের খাওয়াইয়াছি। তোমার এমন ধনলাভ হইয়াছে যাহা চিরকাল থাকিবে!' কিন্তু সেরূপ ধনের প্রতি কালুর বড়ো একটা লোভ ছিল না। সুতরাং সে রাগিয়া ছেলেকে মারিতে লাগিল। এমন সময়ে সে প্রদেশের ক্ষুদ্র রাজা পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার নাম রায়বোলার। নানককে মারিতে দেখিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইয়াছে? এত গোল কেন?' যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন তখন তিনি কালুকে খুব করিয়া তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, 'আর যদি কখনো নানকের গায়ে হাত তোল তো দেখিতে পাইবে।' এমন-কি, রাজা অত্যন্ত ভক্তির সহিত নানককে প্রণাম করিলেন। লোকে বলে যে, যখন সাপ নানককে ছাতা ধরিয়াছিল তখন রাজা তাহা দেখিয়াছিলেন, এই জন্যই নানকের উপর তাঁহার এত ভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে সাপের ছাতা-ধরা সমস্তই গুজব; আসল কথা, নানকের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নানক একজন মস্তলোক।

নানকের উপর আর তো মারধোর চলে না। কালু অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন।

জয়রাম নানকের ভগিনীপতি। পাঠান দৌলতখাঁর শস্যের গোলা জয়রামের জিম্মায় ছিল। কালু স্থির করিলেন, নানককেও জয়রামের কাজে লাগাইয়া দিবেন, তাহা হইলে ক্রমে নানক কাজের লোক হইয়া উঠিবেন। নানকের বাপ যখন নানকের কাছে এই প্রস্তাব করিলেন তখন তিনি

বলিলেন, 'আচ্ছা।' এই বলিয়া নানক সুলতানপুরে জয়রামের কাছে গিয়া উপস্থিত। সেখানে দিনকতক বেশ কাজ করিতে লাগিলেন। সকলের 'পরেই তাঁহার ভালোবাসা ছিল, এইজন্য সুলতানপুরের সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিতে লাগিল। কিন্তু কাজে মন দিয়া নানক তাঁহার আসল কাজটি ভুলেন নাই। তিনি ঈশ্বরের কথা সর্বদাই ভাবিতেন।

এমন কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদিন সকালে নানক একলা বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে বলিল, 'নানক, তুমি আজকাল কী লইয়া আছ বলো দেখি। এ-সকল কাজকর্ম ছাড়িয়া দাও। চিরদিনের যে যথার্থ ধন তাহাই উপার্জনের চেষ্টা করো।' ফকির যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে, ধর্ম উপার্জন করো, পরের উপকার করো, পৃথিবীর ভালো করো, ঈশ্বরে মন দাও—টাকা রোজগার করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার চেয়ে ইহাতে বেশি কাজ দেখে।

ফকিরের এই কথাটা হঠাৎ এমনি নানকের মনে লাগিল যে তিনি চমকিয়া উঠিলেন, ফকিরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন ও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্ছা ভাঙিতেই তিনি গরিব লোকদিগকে ডাকিলেন ও শস্য যাহা-কিছু ছিল সমস্ত তাহাদিগকে বিলাইয়া দিলেন। নানক আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না। কাজকর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তিনি পলাইয়া গেলেন।

নানক পলাইলেন বটে কিন্তু অনেক লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। যাঁহার ধর্মের দিকে এত টান, এমন মধুর ভাব, এমন মহৎ স্বভাব, তিনি সকলকে ছাড়িলেও তাঁহাকে সকলে ছাড়ে না। মর্দানা তাঁহার সঙ্গে গেল; সে ব্যক্তি বীণা বাজাইত, গান গাহিত। লেনা তাঁহার সঙ্গে গেল। সেই-যে পুরানো চাকর বালসিন্ধু ছেলেবেলায় নানকের সঙ্গে লুন বিক্রয় করিয়া টাকা লাভ

করিতে গিয়াছিল আজও সে নানকের সঙ্গে চলিল; এবারেও বোধ করি কিঞ্চিৎ ধনলাভের আশা ছিল, কিন্তু যে-সে ধন নয়, সকল ধনের শ্রেষ্ঠ যে ধন সেই ধর্ম। রামদাসও নানককে ছাড়িতে পারিল না; তাহার বয়স বেশি হইয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাকে বলিত বুড্ঢা। আর কত নাম করিব, এমন ঢের লোক সঙ্গে গেল।

নানক যথাসাধ্য সকলের উপকার করিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি ভালোবাসিতেন। হিন্দুধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন, মুসলমান ধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন। অথচ হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। নানক আমাদের বাংলাদেশেও আসিয়াছিলেন। শিবনাভ বলিয়া কোন্‌-এক দেশের রাজা নানা লোভ দেখাইয়া নানককে উচ্ছন্ন দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানক তাহাতে ভুলিবেন কেন? উল্‌টিয়া রাজাকে তিনি ধর্মের দিকে লওয়াইলেন। মোগল সম্রাট বাবরের সঙ্গে একবার নানকের দেখা হয়। সম্রাট নানকের সাধুভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর টাকা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নানক তাহা লইলেন না; তিনি বলিলেন, 'যে জগদীশ্বর সকল লোককে অন্ন দিতেছেন, অনুগ্রহ ও পুরস্কার আমি তাঁহারই কাছ হইতে চাই, আর-কাহারও কাছে চাই না।' নানক যখন মক্কায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন তখন একদিন তিনি মস্‌জিদের দিকে পা করিয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাহাই দেখিয়া একজন মুসলমানের বড়ো রাগ হইল। সে তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল, 'তুমি কেমন লোক হে! ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে পা করিয়া তুমি ঘুমাইতেছ!' নানক বলিলেন, 'আচ্ছা ভাই, জগতের কোন্ দিকে ঈশ্বরের মন্দির নাই একবার দেখাইয়া দাও!' নানক লোক ভুলাইবার জন্য কোনো

আশ্চর্য কৌশল দেখাইয়া কখনো আপনাকে মস্ত লোক বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন নাই। গল্প আছে একবার কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আচ্ছা, তুমি যে একজন মস্ত সাধু, আমাদিগকে একটা কোনো আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা দেখাও দেখি।' নানক বলিলেন, 'তোমাদিগকে দেখাইবার যোগ্য আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল পবিত্র ধর্মের কথা জানি, আর কিছুই জানি না। ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অস্থায়ী।'

নানক অনেক দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থ হইলেন। গৃহে থাকিয়া তিনি সকলকে ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি কোরান পুরাণ কিছুই মানিতেন না। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতেন, এক ঈশ্বরকে পূজা করো, ধর্মে মন দাও, অন্য সকলের দোষ মার্জনা করো, সকলকে ভালোবাসো। এইরূপ সমস্ত জীবন ধর্মপথে থাকিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া সত্তর বৎসর বয়সে নানকের মৃত্যু হয়।

কালু বেশি কাজের লোক ছিল কি কালুর ছেলে নানক বেশি কাজের লোক ছিল আজ তাহার হিসাব করিয়া দেখো দেখি! আজ যে শিখ জাতি দেখিতেছ, যাহাদের সুন্দর আকৃতি, মহৎ মুখশ্রী, বিপুল বল, অসীম সাহস দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়, এই শিখ জাতি নানকের শিষ্য। নানকের পূর্বে এই শিখ জাতি ছিল না। নানকের মহৎ ভাব ও ধর্মবল পাইয়া এমন একটি মহৎ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। নানকের ধর্মশিক্ষার প্রভাবেই ইহাদের হৃদয়ের তেজ বাড়িয়াছে, ইহাদের শির উন্নত হইয়াছে, ইহাদের চরিত্রে ও ইহাদের মুখে মহৎ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালু যে টাকা রোজগার করিয়াছিল নিজের উদরেই তাহা খরচ করিয়াছে, আর নানক যে ধর্মধন উপার্জন করিয়াছিলেন আজ চার-শো বৎসর ধরিয়া মানবেরা তাহা ভোগ করিতেছে। কে বেশি কাজ করিয়াছে!

বীর গুরু

বনের একটা গাছে আগুন লাগিলে অন্যান্য যে-সকল গাছে উত্তাপ প্রচ্ছন্ন ছিল সেগুলাও যেমন আগুন হইয়া উঠে, তেমনি যে জাতির মধ্যে একজন বড়োলোক উঠে, সে জাতির মধ্যে দেখিতে দেখিতে মহত্ত্বের শিখা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহার গতি আর কেহই রোধ করিতে পারে না।

নানক যে মহত্ত্ব লইয়া জন্মিয়াছিলেন সে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নিবিয়া গেল না। তিনি যে ধর্মের সংগীত, যে আনন্দ ও আশার গান গাহিলেন, তাহা ধ্বনিত হইতে লাগিল। কত নূতন নূতন গুরু জাগিয়া উঠিয়া শিখদিগকে মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করিতে লাগিলেন।

তখনকার যথেচ্ছাচারী মুসলমান রাজারা অনেক অত্যাচার করিলেন, কিন্তু নবধর্মোৎসাহে দীপ্ত শিখ জাতির উন্নতির পথে বাধা দিতে পারিলেন না। বাধা ও অত্যাচার পাইয়া শিখেরা কেমন করিয়া বীর জাতি হইয়া উঠিল তাহার গল্প বলি শুন।

নানকের পর পঞ্জাবে আটজন গুরু জন্মিয়াছেন, আটজন গুরু মরিয়াছেন, নবম গুরুর নাম তেগ্‌বাহাদুর। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন নিষ্ঠুর আরঙ্গীব দিল্লির সম্রাট ছিলেন। রামরায় বলিয়া তেগ্‌বাহাদুরের একজন শত্রু সম্রাটের সভায় বাস করিত। তাহারই কথা শুনিয়া সম্রাট তেগ্‌বাহাদুরের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।

আরঙ্গীবের লোক যখন তেগ্‌বাহাদুরকে ডাকিতে আসিল তখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার আর রক্ষা নাই। যাইবার সময়ে তিনি তাঁহার ছেলেকে কাছে ডাকিলেন। ছেলের নাম গোবিন্দ, তাহার বয়স চোদ্দ বৎসর। পূর্বপুরুষের তলোয়ার গোবিন্দের কোমরে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বলিলেন, 'তুমিই শিখেদের গুরু হইলে। সম্রাটের আদেশে ঘাতক

আমাকে যদি বধ করে তো আমার শরীরটা যেন শেয়াল-কুকুরে না খায়! আর এই অন্যায় অত্যাচারের বিচার তুমি করিয়ো, ইহার প্রতিশোধ তুমি লইয়ো।' বলিয়া তিনি দিল্লি চলিয়া গেলেন।

রাজসভায় তাঁহাকে তাঁহার গোপনীয় কথা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করা হইল। কেহ বা বলিল, 'আচ্ছা, তুমি যে মস্ত লোক তাহার প্রমাণস্বরূপ একটা অলৌকিক কারখানা দেখাও দেখি!' তেগ্‌বাহাদুর বলিলেন, 'সে তো আমার কাজ নহে। মানুষের কর্তব্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া থাকা। তবে তোমাদের অনুরোধে আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইতে পারি। একটা কাগজে মন্ত্র লিখিয়া ঘাড়ে রাখিয়া দিব, সে ঘাড় তলোয়ারে বিচ্ছিন্ন হইবে না।' এই বলিয়া মন্ত্র-লেখা কাগজ ঘাড়ে রাখিয়া তিনি ঘাড় পাতিয়া দিলেন। ঘাতক তরবারি উঠাইয়া আঘাত করিল। মাথা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কাগজ তুলিয়া লইয়া সকলে দেখিল, তাহাতে লেখা আছে, 'শির দিয়া, সির নেহি দিয়া।' অর্থাৎ 'মাথা দিলাম, গুপ্তকথা দিলাম না।' এইরূপে মাথা দিয়া তেগ্‌বাহাদুর রাজসভার প্রশ্নের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

বালক গোবিন্দের মনে বড়ো আঘাত লাগিল। মুসলমানদের যথেচ্ছাচার নিবারণ করিবেন এই তাঁহার সংকল্প হইল। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিলে তো কিছুই হয় না; এখনও সুসময়ের জন্য ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে, আয়োজন করিতে হইবে, বহুদিন অবিশ্রাম চিন্তা করিয়া মনে মনে সমস্ত সংকল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে, তবে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যাহারা দুই দিনেই দেশের উপকার করিয়া সমস্ত চুকাইয়া দিতে চায়, যাহাদের ধৈর্য নাই, যাহারা অপেক্ষা করিতে জানে না, তাহাদের তড়িঘড়ি কাজ ও আড়ম্বর দেখিয়া লোকের চমক লাগিয়া যায়, কিন্তু

তাহারা বড়ো লোক নহে, তাহাদের কাজ স্থায়ী হয় না। তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যের জন্য সমস্ত জীবন দিতে চাহে না, জীবনের গোটাকতক দিন দিতে চাহে মাত্র, অথচ তাড়াতাড়ি বড়ো লোক বলিয়া খুব একটা প্রশংসা পাইতে চাহে। গোবিন্দ সেরূপ লোক ছিলেন না। তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া যমুনাতীরের ছোটো ছোটো পাহাড়ের মধ্যে বিজনে পারস্যভাষা-শিক্ষা ও শাস্ত্র-অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; বাঘ ও বন্য শূকর শিকার করিয়া এবং মনে মনে আপনার সংকল্প স্থির করিয়া অবসরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

গুরুগোবিন্দের শিষ্যেরা তাঁহার চারি দিকে জড়ো হইতে লাগিল। সমস্ত শিখজাতিকে একত্রে আহ্বান করিবার জন্য তিনি চারি দিকে তাঁহার শিষ্যদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে সমস্ত পাঞ্জাব হইতে বিস্তর লোক আসিয়া তাঁহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, দেব-দৈত্য সকলেই নিজের উপাসনা প্রচলিত করিতে চায়; গোরখনাথ রামানন্দ প্রভৃতি ধর্মমতের প্রবর্ত্তকেরা নিজের নিজের এক-একটা পন্থা বাহির করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে মহম্মদ নিজের নাম উচ্চারণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি, গোবিন্দ, ধর্মপ্রচার, পুণ্যের জয়-বিস্তার ও পাপের বিনাশ-সাধনের জন্য আসিয়াছেন। অন্যান্য মানুষও যেমন তিনিও তেমনি একজন; তিনি পিতা পরমেশ্বরের দাস; এই পরমাশ্চর্য জগতের একজন দর্শক মাত্র; তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া যে পূজা করিবে নরকে তাহার গতি হইবে। কোরান পুরাণ পাঠ করিয়া, প্রতিমা বা মৃত ব্যক্তির পূজা করিয়া, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে বা কোনো প্রকার পূজার কৌশলে ঈশ্বর মিলে না। বিনয়ে ও ভক্তিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

তিনি বলিলেন, 'আজ হইতে সমস্ত লোক এক হইয়া গেল। উচ্চ-নীচের প্রভেদ রহিল না। জাতিভেদ উঠিয়া গেল। সকলে অত্যাচারী তুর্ক জাতির বিনাশের ব্রত গ্রহণ করিলাম।'

জাতিভেদ উঠিয়া গেল শুনিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, অনেকে রাগ করিয়া চলিয়া গেল। গোবিন্দ বলিলেন, 'যাহারা নীচে আছে তাহাদিগকে উঠাইব, যাহাদিগকে সকলে ঘৃণা করে তাহারা আমার পাশে স্থান পাইবে।' ইহা শুনিয়া নীচজাতির লোকেরা অত্যন্ত আনন্দ করিতে লাগিল। এই সময়ে গোবিন্দ সমস্ত শিখ জাতিকে সিংহ উপাধি দিলেন। কুড়ি হাজার লোক গোবিন্দের দলে রহিল।

এইরূপে গোবিন্দ শিখ জাতিকে নূতন উৎসাহে দীপ্ত করিয়া ধনমানের আশা বিসর্জন করিয়া নিজের সংকল্প-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দের যদি মনের আশা থাকিত তাহা হইলে তিনি অনায়াসে আপনাকে দেবতা বলিয়া চালাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ধনের প্রতি গোবিন্দের বিরাগ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে বলি। গোবিন্দের একজন ধনী শিষ্য তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যের একজোড়া বলয় উপহার দিয়াছিল। গোবিন্দ তাহার মধ্য হইতে একটি বলয় লইয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। দৈবাৎ পড়িয়া গেছে মনে করিয়া একজন শিখ পাঁচ শত টাকা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া একজন ডুবারিকে সেই বলয় খুঁজিয়া আনিতে অনুরোধ করিল। সে বলিল, 'আমি খুঁজিয়া আনিতে পারি, যদি আমাকে ঠিক জায়গাটা দেখাইয়া দেওয়া হয়।' শিখ গোবিন্দকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বালা কোন্‌খানে পড়িয়া গেছে। গোবিন্দ অবশিষ্ট বালাটি লইয়া জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'ওইখানে।' শিখ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আর খুঁজিল না।

হিমালয়ের ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে গুরু গোবিন্দের এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে গোবিন্দের জয় হয়। মুখোয়াল-নামক স্থানে থাকিয়া গোবিন্দ চারিটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিলেন। দুই বৎসর যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া চারি দিকের অনেক দেশ জয় ও অধিকার করিলেন। পর্বতের রাজারা ইহাতে ভয় পাইয়া দিল্লির সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল। জবর্দস্তখাঁ ও শম্‌স্‌খাঁ নামক দুই আমীরকে সম্রাট পার্বত্য রাজাদের সাহায্যে নিয়োগ করিলেন। এইরূপে দুই মুসলমান আমীর এবং পর্বতের রাজারা একত্র হইয়া মুখোয়াল দুর্গ ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্গের বাহিরে সাত মাস ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল। অবশেষে গোবিন্দ তাঁহার দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার আহার ফুরাইয়া গেল। তাহা ছাড়া গোবিন্দের অনুচরেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। এ দিকে তাঁহার মা গুজরী একদিন রাত্রে গোবিন্দের দুটি ছেলে লইয়া দুর্গ হইতে পালাইয়া গেলেন। কিন্তু ছেলে দুটিকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পথের মধ্যে সির্হিন্দ-নামক স্থানে মুসলমানেরা তাহাদিগকে জীবিত অবস্থায় পুঁতিয়া ফেলে। গুজরী সেই শোকে প্রাণত্যাগ করেন। এ দিকে আহারাভাবে গোবিন্দ অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। তাঁহার অনুচরেরা আর থাকিতে চাহে না। তিনি তাহাদিগকে ভীরু বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। দুর্গের দরজা খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'এস তবে আর-একবার যুদ্ধ করিয়া দেখা যাক্। যদি মরি তাহা হইলে কীর্তি থাকিয়া যাইবে; যদি জয়লাভ করি তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল। বীরের মতো মরিলে গৌরব আছে, ভীরুর মতো মরা হীনতা।' কিন্তু গোবিন্দের কথা কেহ মানিল না। তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিয়া অনুচরেরা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গেল। কেবল চল্লিশ

জন গোবিন্দের সঙ্গে রহিল। গোবিন্দ তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরাও যাও!' তাহারা বলিল, 'যে শিখেরা ছাড়িয়া পালাইয়াছে তাহাদিগকে মাপ করো গুরু, আমরা তোমার জন্য প্রাণ দিব।' এই চল্লিশ জন অনুচর সঙ্গে লইয়া মুখোয়াল হইতে পালাইয়া গুরু চমকৌর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সেখানেও বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে ঘিরিল। প্রাতঃকালে দুর্গের দ্বার খুলিয়া তাঁহারা মুসলমানদের উপর গিয়া পড়িলেন। বিপক্ষ পক্ষের অনেকগুলিকে মারিলেন এবং তাঁহাদেরও অনেকগুলি মরিল। কেবল পাঁচ জন মাত্র বাকি রহিল। গোবিন্দের দুই পুত্র রণজিৎ ও অজিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ আবার পলায়ন করিলেন। বহুদিন ধরিয়া পথে অনেক বিপদ-আপদ সহ্য করিয়া অবশেষে গোবিন্দ একে একে পলাতক শিষ্যদিগকে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এইরূপে গোবিন্দের অধীনে বারো হাজার সৈন্য জড়ো হইল।

মুসলমানেরা এই খবর পাইয়া তাঁহাকে আবার আক্রমণ করিল। শিখেরা বলিল, 'এবার হয় জয় করিব নয় মরিব।' জয় হইল। মুক্তসরের নিকট যুদ্ধে মুসলমানদের সম্পূর্ণ হার হইল। এই জয়ের খবর চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রত্যহ চারি দিক হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া গোবিন্দের দলে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সম্রাট্ আরঙ্জীব তখন দক্ষিণে ছিলেন। গোবিন্দের জয়ের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহার কাছে হাজির হইবার জন্য গোবিন্দকে এক আদেশপত্র পাঠাইয়া দিলেন। গোবিন্দ তাহার উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'তোমার উপরে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। তুমি আমাদের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছ শিখেরা তাহার প্রতিশোধ লইবে।' গোবিন্দ তাঁহার পত্রে, মোগলেরা শিখগুরুদিগের প্রতি যে-সকল অত্যাচার

করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'আমার সন্তানেরা বিনষ্ট হইয়াছে; আমার পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি; আমি কাহাকেও ভয় করি না, ভয় করি কেবল জগতের একমাত্র সম্রাট্ রাজার রাজাকে। ভগবানের নিকট দরিদ্রের প্রার্থনা বিফল হয় না; তুমি যে-সকল অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছ একদিন তাহার হিসাব দিতে হইবে।' এই পত্রে গোবিন্দ সম্রাট্‌কে লিখিয়াছিলেন যে, 'তুমি হিন্দুদিগকে মুসলমান করিয়া থাক, আমি মুসলমানদিগকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়া সুখে আছ, কিন্তু সাবধান, আমি চড়াই পাখিকে শিখাইব বাজপাখিকে কী করিয়া ভূমিশায়ী করিতে হয়!' পাঁচ জন শিখের হাত দিয়া এই চিঠি গোবিন্দ সম্রাটের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট্ সেই চিঠি পড়িয়া ক্রুদ্ধ না হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ও সেই পাঁচজন শিখের হাত দিয়া গোবিন্দকে চিঠি ও সওগাত পাঠাইয়া দিলেন। চিঠিতে লিখিয়া দিলেন যে, গোবিন্দ যদি দাক্ষিণাত্যে আসেন তবে সম্রাট্ তাঁহাকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিবেন। এই চিঠি পাইয়া গোবিন্দ কিছুদিন শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আরঙ্গীবের সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন ও সেই অভিপ্রায়ে দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন পথে তখন আরঙ্গীবের মৃত্যু হইয়াছে। দক্ষিণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাহাদুরশা সম্রাট্ হইয়াছেন। বাহাদুরশা বহুবিধ সওগাত উপহার দিয়া গোবিন্দকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর অধিপতি করিয়া দিলেন।

গোবিন্দের মৃত্যুঘটনা বড়ো শোচনীয়। কেহ কেহ বলে, ক্রমাগত শোকে বিপদে নিরাশায় অভিভূত হইয়া গোবিন্দ শেষ দশায় কতকটা পাগলের মতো হইয়াছিলেন ও জীবনের প্রতি তাঁহার অতিশয় বিরাগ

জন্মিয়াছিল। একদিন একজন পাঠান তাঁহার নিকট একটি ঘোড়া বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল ; গোবিন্দ সেই ঘোড়া কিনিয়া তাহার দাম দিতে কিছুদিন বিলম্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে পাঠান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গালি দিয়া তরবারি লইয়া আক্রমণ করিল। গোবিন্দ পাঠানের হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেন।

এই অন্যায় কার্য করিয়া তাঁহার অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি সেই পাঠানের পুত্রকে অনেক অর্থ দান করিলেন। তাহাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তাহার সহিত খেলা করিতেন। একদিন সেই পাঠান-তনয়কে তিনি বলিলেন, 'আমি তোমার পিতাকে বধ করিয়াছি, তুমি যদি তাহার প্রতিশোধ না লও তবে তুমি কাপুরুষ, ভীরু।' কিন্তু সেই পাঠান গোবিন্দকে অত্যন্ত মান্য করিত, এইজন্য সে গোবিন্দের হানি না করিয়া মনে মনে পালাইবার সংকল্প করিল।

আর-একদিন সেই পাঠানের সহিত শতরঞ্চ খেলিতে খেলিতে গোবিন্দ তাহাকে তাহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। সে আর থাকিতে না পারিয়া গোবিন্দের পেটে ছুরি বসাইয়া দিল।

গোবিন্দের অনুচরেরা সেই পাঠানকে ধরিবার জন্য চারি দিক হইতে ছুটিয়া আসিল। গোবিন্দ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, 'আমি উহার কাছে অপরাধ করিয়াছিলাম, ও তাহার প্রতিশোধ দিয়াছে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আমিই উহাকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলাম। উহাকে তোমরা ধরিয়ো না।'

অনুচরেরা গোবিন্দের ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া দিল। কিন্তু জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া গোবিন্দ এক দৃঢ় ধনুক লইয়া সবলে নোওয়াইয়া

ধরিলেন, সেই চেষ্টাতেই তাঁহার ক্ষতস্থানে সেলাই ছিঁড়িয়া গেল ও তাঁহার মৃত্যু হইল।

গোবিন্দ যে সংকল্প সিদ্ধ করিতে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন সে সংকল্প বিফল হইল বটে, কিন্তু তিনিই প্রধানতঃ শিখদিগকে যোদ্ধজাতি করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে একদিন শিখেরা স্বাধীন হইয়াছিল; সে স্বাধীনতার দ্বার তিনিই উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন।

গুরু গোবিন্দই শিখদিগের শেষ গুরু। তিনি মরিবার সময় বন্দা-নামক এক বৈরাগীর উপরে শিখদিগের কর্তৃত্বভার দিয়া যান। তিনি যে সংকল্প অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান সেই সংকল্প পূর্ণ করিবার ভার বন্দার উপরে পড়িল। অত্যাচারী বিদেশীদের হাত হইতে স্বজাতিকে পরিত্রাণ করা গোবিন্দের এক ব্রত ছিল, সেই ব্রত বন্দা গ্রহণ করিলেন।

বন্দার চতুর্দিকে শিখেরা সমবেত হইতে লাগিল। বন্দার প্রতাপে সমস্ত পঞ্জাব কম্পিত হইয়া উঠিল। বন্দা সির্হিন্দ হইতে মোগলদের তাড়াইয়া দিলেন। সেখানকার শাসনকর্তাকে বধ করিলেন। সির্মুরে তিনি এক দুর্গ স্থাপন করিলেন। শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন, এবং জিলা সাহারানপুর মরুভূমি করিয়া দিলেন।

মুসলমানদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। লাহোরের উত্তরে জম্বু পর্বতের উপরে বন্দা নিবাস স্থাপন করিলেন, পঞ্জাবের অধিকাংশই তাঁহার আয়ত্ত হইল।

এই সময়ে দিল্লির সম্রাট্ বাহাদুরশা'র মৃত্যু হইল। তাঁহার সিংহাসন লইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গোলযোগ চলিতে লাগিল। এই সুযোগে শিখেরা সমবেত হইয়া বিপাশা ও ইরাবতীর মধ্যে গুরুদাসপুর-নামক এক বৃহৎ দুর্গ স্থাপন করিল।

লাহোরের শাসনকর্তা বন্দার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হইল। এই জয়ের পর সির্হিন্দে একদল শিখসৈন্য পুনর্বার প্রেরিত হইল। সেখানকার শাসনকর্তা বয়াজিদ্‌খাঁ শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন। একজন শিখ গোপনে বয়াজিদের তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। দিল্লির সম্রাট্ কাশ্মীরের শাসনকর্তা আবদুল সম্মদ্‌খাঁ -নামক এক পরাক্রান্ত

তুরানিকে শিখদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। দিল্লি হইতে তাঁহার সাহায্যার্থে এক দল বাছা বাছা সৈন্য প্রেরিত হইল। সম্মদ্‌-খাঁও সহস্র সহস্র স্বজাতীয় তুরানি সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। লাহোর হইতে কামান-শ্রেণী সংগ্রহ করিয়া তিনি শিখদিগের উপরে গিয়া পড়িলেন। শিখেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। আক্রমণকারীদের বিস্তর সৈন্য নষ্ট হইল। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া বন্দা গুরুদাসপুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রুসৈন্য তাঁহার দুর্গ সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। দুর্গে খাদ্য-যাতায়াত বন্ধ হইল। সমস্ত খাদ্য এবং অখাদ্য পর্যন্ত যখন নিঃশেষ হইয়া গেল তখন বন্দা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ৭৪০ জন শিখ বন্দী হইল। কথিত আছে, যখন বন্দীগণ লাহোরের পথ দিয়া যাইতেছিল তখন বয়াজিদ্‌খাঁর বৃদ্ধা মাতা তাহার পুত্রের হত্যাকারীর মস্তকে পাথর ফেলিয়া দিয়া বধ করিয়াছিল। বন্দা যখন দিল্লিতে নীত হইলেন তখন শত্রুরা শিখদের ছিন্নশির বর্শাফলকে করিয়া তাঁহার আগে আগে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। প্রতিদিন একশত করিয়া শিখ বন্দী বধ করা হইত। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, 'শিখেরা মরিবার সময় কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই; কিন্তু অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আগে মরিবার জন্য তাহারা আপনা-আপনির মধ্যে বিবাদ ও তর্ক করিত। এমন-কি, এইজন্য তাহারা ঘাতকের সঙ্গে ভাব করিবার চেষ্টা করিত।' অষ্টম দিনে বন্দা বিচারকের সমক্ষে আনীত হইলেন। একজন মুসলমান আমীর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এমন বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও এত পাপাচরণে তোমার মতি হইল কী করিয়া?' বন্দা বলিলেন, 'পাপীর শাস্তি-বিধানের জন্য ঈশ্বর আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে যাহা-

কিছু কাজ করিয়াছি তাহার জন্য আবার আমারও শাস্তি হইতেছে।' বিচারকের আদেশে তাঁহার ছেলেকে তাঁহার কোলে বসাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহার হাতে ছুরি দিয়া স্বহস্তে নিজের ছেলেকে কাটিতে হুকুম হইল। অবিচলিত ভাবে নীরবে তাঁহার ক্রোড়স্থ ছেলেকে বন্দা বধ করিলেন। অবশেষে দগ্ধ লৌহের সাঁড়াশি দিয়া তাঁহার মাংস ছিঁড়িয়া তাঁহাকে বধ করা হইল।

বন্দার মৃত্যুর পর মোগলেরা শিখদের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক শিখের মাথার জন্য পুরস্কার-স্বরূপ মূল্য ঘোষণা করা হইল।

শিখেরা জঙ্গলে ও দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইল। প্রতি ছয় মাস অন্তর তাহারা একবার করিয়া অমৃতসরে সমবেত হইত। পথের মধ্যে যে-সকল জমিদার ছিল তাহারা ইহাদিগকে পথের বিপদ হইতে রক্ষা করিত। এই যাণ্মাসিক মিলনের পর আবার তাহারা জঙ্গলে ছড়াইয়া পড়িত।

পঞ্জাব জঙ্গলে আবৃত হইয়া উঠিল। নাদিরশা আফগানিস্থান হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সময় পঞ্জাব দিয়া আসিতেছিলেন। নাদিরশা জিজ্ঞাসা করিলেন, শিখদের বাসস্থান কোথায়? পঞ্জাবের শাসনকর্তা উত্তর করিলেন, ঘোড়ার পৃষ্ঠের জিনই শিখদের বাসস্থান।

নাদিরশাহের ভারত-আক্রমণকালে শিখেরা ছোটো ছোটো দল বাঁধিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্তী পারসিক সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিতে লাগিল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে রত হইয়া শিখেরা পুনশ্চ দুঃসাহসিক হইয়া উঠিল। এখন তাহারা প্রকাশ্যভাবে শিখতীর্থ অমৃতসরে যাতায়াত করিতে লাগিল। একজন মুসলমান লেখক বলেন—প্রায়ই দেখা যায়, অশ্বারোহী শিখ পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া তাহাদের তীর্থ উপলক্ষে

চলিয়াছে। কখনো কখনো কেহ বা ধৃতও হইত, কেহ বা হতও হইত, কিন্তু কখনো এমন হয় নাই যে, একজন শিখ ভয়ে তাহার স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। অবশেষে শিখেরা উত্তরোত্তর নির্ভীক হইয়া ইরাবতীর তীরে এক ক্ষুদ্র দুর্গ স্থাপন করিল। ইহাতেও মুসলমানেরা বড়ো একটা মনোযোগ দিল না। কিন্তু তাহারা যখন বৃহৎ দল বাঁধিয়া আমিনাবাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে কর আদায় করিতে সমবেত হইল, তখন মুসলমান সৈন্য তাহাদের আক্রমণ করিল। কিন্তু মুসলমানেরা পরাজিত হইল ও তাহাদের সেনাপতি বিনষ্ট হইল। মুসলমানেরা অধিকসংখ্যক সৈন্য লইয়া দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিল ও শিখদিগকে পরাভূত করিল। লাহোরে এই উপলক্ষে বিস্তর শিখবন্দী নিহত হয়। যেখানে এই বধ-কার্য সমাধা হয় লাহোরের সেই স্থান স্থহিদগঞ্জ নামে অভিহিত। এখনো সেখানে ভাই তরুসিংহের কবরস্থান আছে। কথিত আছে, তরুসিংহকে তাঁহার দীর্ঘ কেশ ছেদন করিয়া শিখধর্ম ত্যাগ করিতে বলা হয়। কিন্তু গুরুগোবিন্দের এই বৃদ্ধ অনুচর তাঁহার ধর্ম ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন এবং শিখদের শাস্ত্রানুমোদিত জাতীয় চিহ্নস্বরূপ দীর্ঘ কেশ ছেদন করিতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'চুলের সঙ্গে খুলির সঙ্গে এবং খুলির সঙ্গে মাথার সঙ্গে যোগ আছে। চুলে কাজ কী, আমি মাথাটা দিতেছি।'

এইরূপে ক্রমাগত জয়পরাজয়ের মধ্যে সমস্ত শিখ জাতি আন্দোলিত হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা নিরুদ্যম হইল না। এক সময়ে যখন তাহারা সির্হিন্দের শাসনকর্তা জেইনখাঁর উপরে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে দুর্দান্তপরাক্রম পাঠান আমেদ-শা তাঁহার বৃহৎ সৈন্যদল -সমেত তাহাদের উপর আসিয়া পড়িলেন। এই

যুদ্ধে শিখদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়, তাহাদের বিস্তর লোক মারা যায়। আমেদশা অমৃতসরের শিখ-মন্দির ভাঙিয়া দিলেন। গোরক্ত ঢালিয়া অমৃতসরের সরোবর অপবিত্র করিয়া দিলেন। শিখদের ছিন্ন শির স্তূপাকার করিয়া সজ্জিত করিলেন। এবং কাফের শত্রুদের রক্তে মস্‌জিদের ভিত্তি ধৌত করিয়া দিলেন।

কিন্তু ইহাতেও শিখেরা নিরুত্তম হইল না। প্রতিদিন তাহাদের দল বাড়িতে লাগিল। প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি সমস্ত জাতির হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রথমে তাহারা কসুর-নামক পাঠানদের উপনিবেশ আক্রমণ লুণ্ঠন ও গ্রহণ করিল। তাহার পরে তাহারা সির্হিন্দে অগ্রসর হইল। সেখানকার শাসনকর্তা জেইনখাঁর সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে পাঠান পরাজিত ও নিহত হইল। শতদ্রু হইতে যমুনা পর্যন্ত সির্হিন্দ প্রদেশ শিখদের করতলস্থ হইল। লাহোরের শাসনকর্তা কাবুলি-মলকে শিখেরা দূর করিয়া দিল। ঝিলম হইতে শতদ্রু পর্যন্ত সমস্ত পঞ্জাব শিখদের হাতে আসিল। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড সর্দারেরা মিলিয়া ভাগ করিয়া লইলেন। শিখেরা বিস্তর মস্‌জিদ ভাঙিয়া ফেলিল। শৃঙ্খলবদ্ধ আফগানদের দ্বারা শূকররক্তে মস্‌জিদ-ভিত্তি ধৌত করানো হইল। সর্দারেরা অমৃতসরে সম্মিলিত হইয়া আপনাদের প্রভাব প্রচার এবং শিখ-মুদ্রা প্রচলিত করিলেন।

এতদিন পরে শিখেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল। গুরু গোবিন্দের উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সফল হইল। তার পরে রণজিৎসিংহের অভ্যুদয়। তার পরে ব্রিটিশ-সিংহের প্রতাপ। তার পরে ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতবর্ষ লাল হইয়া গেল। রণজিতের বিখ্যাত ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হইল। সে সকল কথা পরে হইবে।

আমরা একদিন মনে করিয়াছিলাম যে, সহস্রবর্ষব্যাপী দাসত্বের নিপীড়নে রাজপুতদিগের বীর্যবহ্নি নিভিয়া গিয়াছে ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের দেশানুরাগ ও রণকৌশল ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেদিন বিদ্রোহের ঝটিকার মধ্যে দেখিয়াছি কত বীরপুরুষ উৎসাহে প্রজ্জলিত হইয়া স্বকার্য-সাধনের জন্য সেই গোলমালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যুঝাযুঝি করিয়া বেড়াইয়াছেন। তখন বুঝিলাম যে, বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে যে-সকল গুণ নিদ্রিতভাবে অবস্থিতি করে এক-একটা বিপ্লবে সেই-সকল গুণ জাগ্রত হইয়া উঠে। সিপাহি যুদ্ধের সময় অনেক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁহাদের বীর্য অযথা পথে নিয়োজিত করিয়াছিলেন এ কথা স্বীকার করিলেও মানিতে হইবে যে, তাঁহারা যথার্থ বীর ছিলেন। তাঁতিয়াটোপী ও কুমারসিংহ ক্ষুদ্র দুইটি বিদ্রোহী মাত্র নহেন, ইতিহাস লিখিতে হইলে পৃথিবীর মহা মহা বীরের নামের পার্শ্বে তাঁহাদের নাম লিখা উচিত; যে অশীতিবর্ষীয় অশ্বারোহী কুমারসিংহ লোল ভ্রূ রজ্জুতে বাঁধিয়া দুই হস্তে কৃপাণ লইয়া হাইলণ্ডর সৈন্যদলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন— যে তাঁতিয়াটোপী কতকগুলি বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল লইয়া, যথোচিত অস্ত্র নাই, আহার নাই, অর্থ নাই, অথচ ভারতবর্ষে বিদেশীয় শাসন বিচলিতপ্রায় করিয়াছিলেন— যদিও তাঁহাদের কার্য লইয়া গৌরব করিবার আমাদিগের অধিকার নাই, তথাপি তাঁহাদের বীর্যের, উদ্যমের, জলন্ত উৎসাহের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষের কী দুর্ভাগ্য, এমন সকল বীরেরও জীবনী বিদেশীয়দের পক্ষপাতী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

সিপাহি-যুদ্ধের সময় রাসেল টাইম্‌স্ পত্রে লিখেন যে, 'তাঁতিয়াটোপী মধ্য-ভারতবর্ষকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বড়ো বড়ো থানা ও

ধনাগার লুঠ করিয়াছেন, অস্ত্রাগার শূন্য করিয়াছেন, বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়াছেন, বিপক্ষসৈন্য বলপূর্বক তাঁহার সমুদয় অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আবার যুদ্ধ করিয়াছেন, পরাজিত হইয়াছেন, পুনরায় ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের নিকট হইতে কামান লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, বিপক্ষসৈন্যেরা পুনরায় তাহা অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আবার সংগ্রহ করিয়াছেন, আবার হারাইয়াছেন। তাঁহার গতি বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত। সপ্তাহ ধরিয়া তিনি প্রত্যহ কুড়ি-পঁচিশ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছেন, নর্মদা এ পার হইতে ও পার, ও পার হইতে এ পার ক্রমাগত পার হইয়াছেন। তিনি কখনো আমাদের সৈন্য-শ্রেণীর মধ্য দিয়া, কখনো পার্শ্ব দিয়া, কখনো সম্মুখ দিয়া, সৈন্য লইয়া গিয়াছেন। পর্বতের উপর দিয়া, নদী অতিক্রম করিয়া, শৈলপথে, উপত্যকায়, জলার মধ্য দিয়া, কখনো সম্মুখে, কখনো পশ্চাতে, কখনো পার্শ্বে, কখনো তির্যক্ ভাবে চলিয়াছেন। ডাকগাড়ির উপর পড়িয়া, চিঠি অপহরণ করিয়া, গ্রাম লুঠিয়া, কখনো বা সৈন্য চালনা করিতেছেন, কখনো বা পরাজিত হইয়া পলাইতেছেন, অথচ কেহ তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছে না।' এই অসামান্য বীর যখন পারোনের জঙ্গলের মধ্যে ঘুমাইতেছিলেন তখন মানসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। গুরুভার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, সৈনিক-বিচারালয়ে আহূত হইয়া তিনি ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার প্রকৃতি নির্ভীক ও প্রশান্ত ছিল। তিনি বিচারের প্রার্থনা করেন নাই, তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'আমি ব্রিটিশ গবর্ন্‌মেন্টের হস্তে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কিছুই আশা করি না। কেবল এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমার প্রাণদণ্ড যেন শীঘ্রই সমাধা হয় ও আমার জন্য যেন আমার নির্দোষী বন্দী পরিবারেরা কষ্ট ভোগ না করে।'

ইংরেজরা যদি স্বার্থপর বণিক্ জাতি না হইতেন, যদি বীরত্বের প্রতি তাঁহাদের অকপট ভক্তি থাকিত, তবে হতভাগ্য বীরের এরূপ বন্দীভাবে অপরাধীর ন্যায় অপমানিত হইয়া মরিতে হইত না, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তরমূর্তি এতদিনে ইংলণ্ডের চিত্রশালায় শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হইত। যে ঔদার্যের সহিত আলেকজাণ্ডার পুরুরাজের ক্ষত্রিয়োচিত স্পর্ধা মার্জনা করিয়াছিলেন সেই ঔদার্যের সহিত তাঁতিয়াটোপীকে ক্ষমা করিলে কি সভ্যতাভিমানী ইংরাজ জাতির পক্ষে আরো গৌরবের বিষয় হইত না? যাহা হউক, ইংরাজেরা এই অসামান্য ভারতবর্ষীয় বীরের শোণিতে প্রতি-হিংসারূপ পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন।

আমরা সিপাহি-যুদ্ধ -সময়ের আরো অনেক বীরের নামোল্লেখ করিতে পারি যাঁহারা ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, কবির সংগীতে, প্রস্তরের প্রতিমূর্তিতে, অভ্রভেদী স্মরণস্তম্ভে, অমর হইয়া থাকিতেন। বৈদেশিকদের লিখিত ইতিহাসের এক প্রান্তে তাঁহাদের জীবনীর দুই-এক ছত্র অনাদরে লিখিত রহিয়াছে, ক্রমে ক্রমে কালের স্রোতে তাহাও ধৌত হইয়া যাইবে এবং আমাদের ভবিষ্যবংশীয়দের নিকট তাঁহাদের নাম পর্যন্ত অজ্ঞাত থাকিবে।

শংকরপুরের রানা বেণীমাধু লর্ড্ ক্লাইভের আগমনে নিজে দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার ধনসম্পত্তি অনুচরবর্গ কামান ও অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যার বেগম ও বির্জিস্ কাদেরের সহিত যোগ দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকেই আপনার অধিপতি বলিয়া জানিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে রাজার ন্যায় মান্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট্ তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য

প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন, তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তাঁহার ক্ষতি পূরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু রাজা সমুদয় প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া বেগম ও তাঁহার পুত্রের জন্য টেরাই প্রদেশে আশ্রয়হীন ও রাজ্যহীন হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বেণীমাধু জীবনের বিনিময়েও তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই এবং ইংরাজদের হস্তে কোনোমতে আত্মসমর্পণ করেন নাই। রাজপুত বীর নহিলে আপনার প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য কয়জন লোক এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে ?

রয়ার রাজপুত অধিপতি নৃপৎসিং খঞ্জ ছিলেন। তিনি যুদ্ধের সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'ঈশ্বর আমার একটি অঙ্গ লইয়াছেন, অবশিষ্ট অঙ্গগুলি আমার দেশের জন্য দান করিব।'

কিন্তু আমরা সর্বাপেক্ষা বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। তাঁহার যথার্থ ও বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর, অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাওয়া গেল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

লর্ড ড্যাল্‌হৌসী ঝান্সী রাজ্য ইংরাজ-শাসনভুক্ত করিলেন এবং ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের জন্য অনুগ্রহ করিয়া উপজীবিকা-স্বরূপ যৎসামান্য বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। এই স্বল্প বৃত্তি রানীর সম্ভ্রম-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, এই নিমিত্ত তিনি প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, অবশেষে অগত্যা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না, লক্ষ্মীবাঈয়ের মৃত স্বামীর যাহা-কিছু ঋণ ছিল তাহা রানীর জীবিকা হইতে পরিশোধ করিতে লাগিলেন। রানী ইহাতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। ইংরাজরা

তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা আরম্ভ করিল, ইহাতে রাজ্ঞী ও নগরবাসীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করিল, কিন্তু তাহাও গ্রাহ্য হইল না।

এইরূপে রাজ্যহীনা, সম্পত্তিহীনা, অভিমানিনী রাজ্ঞী নিষ্ঠুর অপমানে মনে মনে প্রতিহিংসার অগ্নি পোষণ করিতে লাগিলেন এবং যেমন শুনিলেন কোম্পানির সৈনিকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, অমনি তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য স্বকুমার দেহ রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। লক্ষ্মীবাঈ অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের কিছু অধিক, তাঁহার দেহ যেমন বলিষ্ঠ মনও তেমনি দৃঢ় ছিল।

রাজ্ঞী অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। রাজ্যপালনের জটিল ব্যাপার-সকল অতি সুন্দররূপে বুঝিতেন। ইংরাজ কর্মচারীগণ তাঁহাদের জাতিগত স্বভাব-অনুসারে এই হৃতরাজ্য রাজ্ঞীর চরিত্রে নানাবিধ কলঙ্ক আরোপ করিলেন, কিন্তু এখনকার ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে তাহার এক বর্ণও সত্য নহে।

ঝান্সী নগরী অতিশয় পরিপাটী পরিচ্ছন্ন, উহা দৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের কুঞ্জ ও সরোবরে সেই-সকল প্রাচীরের চতুর্দিক সুশোভিত ছিল। একটি উচ্চ শৈলের উপর দৃঢ়দুর্গবদ্ধ রাজপ্রাসাদ দাঁড়াইয়া আছে। নগরীতে বাণিজ্যব্যবসায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া অনেক ইংরাজ অধিবাসী সেখানে বাস করিত। কাপ্তেন ডান্‌লপের হস্তে ঝান্সী নগরীর রক্ষাভার ছিল। ভারতবর্ষে যখন বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে সতর্ক হইতে পরামর্শ দেন, কিন্তু ঝান্সীর শান্ত অবস্থা দেখিয়া তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

এই প্রশান্ত ঝান্সী রাজ্যে বিধবা রাজ্ঞী ও তাঁহার ভৃত্যবর্গের উত্তেজনায়

ভিতরে ভিতরে একটি বিষম বিপ্লব ধূমায়িত হইতেছিল। সহসা একদিন স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় নীরব ঝান্সী নগরীর মর্মস্থল হইতে বিদ্রোহের অগ্নিস্রাব উদ্গীরিত হইল।

প্রকাশ্য দিবালোকে কাণ্টন্‌মেণ্টের মধ্যে দুইটি ডাকবাংলা বিদ্রোহীরা দগ্ধ করিয়া ফেলিল, যেখানে বারুদ ও ধনাগার রক্ষিত ছিল সেখান হইতে বিদ্রোহীদিগের বন্দুক-ধ্বনি শ্রুত হইল, একদল সিপাহী ঐ দুর্গ অধিকার করিয়াছে, তাহারা উহা কোনোমতে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল না। ইউরোপীয়েরা আপনাপন পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া নগরীদুর্গে আশ্রয় লইল। ক্রমে ক্রমে সৈন্যেরা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া অধিকাংশ ইংরাজ সেনানায়কদিগকে নিহত করিল। বিদ্রোহীগণ দুর্গে উপস্থিত হইল।

ক্যাপ্টেন ডান্‌লপ হিন্দু সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তাহারা সেইখানেই তাঁহাকে বন্দুকে হত করিল। দুর্গস্থ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মধ্যাহ্নে বিদ্রোহী সৈন্যেরা দুর্গের নিম্ন অংশ অধিকার করিয়া লইল। পরাজিত ইংরাজ সেনারা বিদ্রোহী সেনাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল, কিন্তু উন্মত্ত সৈন্যেরা তাহাদিগকে নিহত করিল। এই নিধনকার্যে রাজ্ঞীর কোনো হস্ত ছিল না, এমন-কি এ সময়ে রাজ্ঞীর কোনো অনুচরও উপস্থিত ছিল না। যখন রাজ্যে একটিও ইংরাজ অবশিষ্ট রহিল না তখন রাজ্ঞী এই অন্যায়কারীদিগকেও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এক্ষণে কথা উঠিল, কে রাজ্য অধিকার করিবে? রাজ্ঞী সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন; সদাশিব রাও নামে একজন ঐ রাজ্যের প্রার্থী কুরারা দুর্গ অধিকার করিল। পরে রাজ্ঞীর সৈন্যকর্তৃক তাড়িত হইয়া সিন্ধিয়া-রাজ্যে পলায়ন করিল। এইরূপে ইংরাজেরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হত ও তাড়িত হইলে পর ১৮৫৭ খৃ. অব্দে লক্ষ্মীবাঈ হৃত সিংহাসনে

পুনরায় আরোহণ করিলেন। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া লক্ষ্মীবাঈ ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে পুনরায় ইংরাজ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইংরাজ সেনানায়ক সার হিউ রোজ সৈন্যদল-সমভিব্যাহারে ঝান্সী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রস্তরময় নগরপ্রাচীরে ব্রিটিশ কামান গোলা-বর্ষণ আরম্ভ করিল। দুর্গস্থ লোকেরা আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পুরমহিলাগণ দুর্গপ্রাকার হইতে কামান ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল এবং সৈন্যদের খাদ্যাদি বণ্টন করিতে লাগিল, এবং সশস্ত্র ফকিরগণ নিশান হস্তে লইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

৩১শে মার্চ্ রানী দেখিলেন, তাঁতিয়াটোপী ও বানপুরের রাজা অল্প-সংখ্যক সৈন্যদল লইয়া ইংরাজ-শিবির-পার্শ্বে নিবেশ স্থাপন করিয়া সংকেত-অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া দিয়াছেন। হর্ষধ্বনি ও তোপের শব্দে ঝান্সী দুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার পরদিন ইংরাজ সৈন্যদের সহিত তাঁতিয়া টোপীর ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, এই যুদ্ধে তাঁতিয়া টোপীর ১৫০০ সৈন্য হত হইল এবং তিনি পরাজিত হইয়া বেতোয়ার পরপারে পলায়ন করিলেন।

যুদ্ধে প্রত্যহ রাজ্ঞীর পঞ্চাশ-ষাট জন করিয়া লোক মরিতে লাগিল। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট কামানগুলির মুখ বন্ধ করা হইয়াছে এবং ভালো ভালো গোলন্দাজেরা হত হইয়াছে।

ক্রমে ইংরাজ সৈন্যেরা গোলার আঘাতে নগর-প্রাচীর ভেদ করিল এবং প্রাসাদ ও নগরীর প্রধান প্রধান অংশ অধিকার করিল। প্রাসাদের মধ্যে ঘোরতর সম্মুখযুদ্ধ বাধিল। রানীর শরীররক্ষকদের মধ্যে চল্লিশ জন অশ্বশালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। আহত সৈন্যেরা মুমূর্ষু অবস্থাতেও ভূতলে পড়িয়া অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল।

একে একে ৩৯ জন হত হইলে অবশিষ্ট একজন বারুদে আগুন লাগাইয়া দিল, আপনি উড়িয়া গেল ও অনেক ইংরাজ সৈন্যও সেই সঙ্গে হত হইল।

রাত্রেই রাজ্ঞী কতকগুলি অনুচরের সহিত দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, শত্রুরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল এবং আর একটু হইলেই তাঁহাকে ধরিতে সক্ষম হইত। লেপ্টনেন্ট্ বাউকর অশ্বারোহী সৈন্যদলের সহিত ঝান্সী হইতে দশ ক্রোশ পর্যন্ত রাজ্ঞীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে দেখিলেন, অশ্বারোহী লক্ষ্মীবাঈ চারিজন অনুচরের সহিত গমন করিতেছেন; বহুসৈন্যবেষ্টিত বাউকর এই চারিজন অশ্বারোহী-কর্তৃক এমন আহত হইলেন যে, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই সময়ে তাঁতিয়াটোপী কতকগুলি সৈন্য লইয়া রানীর রক্ষক হইলেন।

চউঠা এপ্রিলে ইংরাজেরা সমস্ত ঝান্সীনগরী অধিকার করিয়া লইল। সৈনিকেরা নগরে দারুণ হত্যা আরম্ভ করিল, কিন্তু নগরবাসীরা কিছুতেই নত হইল না। পাঁচ সহস্রেরও অধিক লোক ব্রিটিশ বেয়নেটে বিদ্ধ হইয়া নিহত হইল। নগরবাসীরা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করা অপমান ভাবিয়া স্বহস্তে মরিতে লাগিল। অসভ্য ইংরাজ সৈনিকেরা স্ত্রীলোকদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবে জানিয়া পৌরজনেরা স্বহস্তে স্ত্রীকন্যাগণকে বিনষ্ট করিয়া মরিতে লাগিল।

রাও সাহেব পেশোয়া-বংশের শেষ বাজিরাওর দ্বিতীয় পোষ্যপুত্র। তিনি, তাঁতিয়াটোপী ও ঝান্সী-রানী বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিশদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য কুঞ্চ নগরে সৈন্য স্থাপন করিলেন। অবিরল কামান বর্ষণ করিয়া হিউ রোজ তাঁহাদের তাড়াইয়া দিল। চারি ক্রোশ রানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়না করিয়া সেনাপতি চারিবার ঘোড়ার উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

অবশেষে লক্ষ্মীবাঈ কাল্পীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার এই শেষ অস্ত্রাগার রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। মনে করিয়াছিলেন রাজপুতেরা যোগ দিবে, কিন্তু তাহারা দিল না। ব্রিটিশ সৈন্যেরা একত্র হইয়া আক্রমণ করিল, অদৃঢ়দুর্গ কাল্পীতে রাজ্ঞীর সৈন্য আর তিষ্ঠিতে পারিল না।

কুঞ্চের পরাজয়ের পর তাঁতিয়াটোপী যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন কেহ জানিতে পারিল না। তিনি এখন গোয়ালিয়রের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে ইংরাজদের মিত্ররাজা সিন্ধিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতে-ছিলেন। তাঁতিয়াটোপী অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে অনেকটা কৃতকার্য হইলে পর রাজ্ঞীকে সংবাদ দিলেন। রাজ্ঞী গোপালপুর হইতে রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা রাজার সহিত শত্রুতা করিতে যাইতেছেন না, তবে কিছু অর্থ ও খাদ্যাদি পাইলেই তাঁহারা দক্ষিণে চলিয়া যাইবেন, রাজা তাঁহাদের যেন বাধা না দেন, কারণ বাধা দেওয়া অনর্থক। গোয়ালিয়রের লোকেরা ইংরাজ-বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছে। তাঁহারা তাহাদের নিকট হইতে দুইশত আহ্বানপত্র পাইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজ-ভক্ত সিন্ধিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন।

রাও ও রানী দৃঢ়স্বরে তাঁহাদের অনুচরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আমরা বোধ হয় নাগরিকদিগের নিকট হইতে কোনো বাধা প্রাপ্ত হইব না, যদি বা পাই তবে তোমাদের ইচ্ছা হয় তো পলাইও, কিন্তু আমরা মরিতে প্রস্তুত হইয়াছি।'

পয়লা জুনে সিন্ধিয়া ৮০০০ লোক ও ২৪টি কামান লইয়া বিদ্রোহী-দিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার সৈন্যদল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সিন্ধিয়া তাঁহার শরীররক্ষকদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইলেন,

কিন্তু তাহারা হত ও আহত হইল। সিন্ধিয়া অশ্বারোহণে আগ্রার দিকে পলায়ন করিলেন। মহারানীর মাতা 'গুজ্জারাজা' সিন্ধিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন মনে করিয়া, কৃপাণ লইয়া অশ্বারোহণে তাঁহাকে মুক্ত করিতে গেলেন; অবশেষে সিন্ধিয়া পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ঝান্সী-রাজ্ঞীর সৈন্যগণ সিন্ধিয়ার রাজকোষ হস্তগত করিল এবং তাহা হইতে রানী সৈন্যদের ছয় মাসের বেতন চুকাইয়া দিলেন ও নগরবাসীদিগকে পুরস্কার-দানে সন্তুষ্ট করিলেন। কিন্তু তাঁতিয়াটোপী ও রাজ্ঞী দুর্গরক্ষার কিছুমাত্র আয়োজন করেন নাই; তাঁহারা প্রকাশ্য ক্ষেত্রেই সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন; সমুদায় বন্দোবস্ত রানী একাকীই সম্পন্ন করিতেছিলেন। তিনি সৈনিকের বেশ পরিয়া, যে রৌদ্রে ইংরাজ সেনাপতি চারিবার মূর্ছিত হইয়া পড়েন সেই রৌদ্রে অপরিশ্রান্ত ভাবে মুহূর্ত বিশ্রাম না করিয়া অশ্বারোহণে এখানে ওখানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

সার হিউ রোজ যখন শুনিলেন যে গোয়ালিয়র শত্রুহস্তগত হইয়াছে, তখন সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া রাজ্ঞীসৈন্যের দুর্বল ভাগ আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধের দারুণ বিপ্লবের মধ্যে রাজ্ঞী অসি-হস্তে ইতস্তত অশ্বচালনা করিতেছেন। রাজ্ঞীর সৈন্যেরা ভঙ্গ দিল; বিপক্ষ-সৈন্যদের গুলিতে রাজ্ঞী অত্যন্ত আহত হইলেন। তাঁহার অশ্ব সম্মুখে একটি খাত দেখিয়া কোনোমতে উহা উল্লঙ্ঘন করিতে চাহিল না; লক্ষ্মী-বাঈয়ের স্কন্ধে বিপক্ষের তলবারের আঘাত লাগিল, তথাপি তিনি অশ্বপরিচালনা করিলেন। তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী ভগিনীর মস্তকে তলবারের আঘাত লাগিল এবং উভয়ে পাশাপাশি রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। এই ভগিনী যুদ্ধের সময়ে কোনোক্রমে রাজ্ঞীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই,

অবিশ্রান্ত তাঁহারই সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ বলে যে, তিনি রাজ্ঞীর ভগিনী নহেন, তিনি তাঁহার স্বামীর উপপত্নী ছিলেন।

ইংরাজী ইতিহাস হইতে আমরা রাজ্ঞীর এইটুকু জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা নিজে তাঁহার যেরূপ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

পরিশিষ্ট ২

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ

বর্তমান-সংখ্যক[1] ভারতীতে 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' -নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি যিনি[2] লিখিয়াছেন, তিনি আধুনিক বাঙালী ইতিহাসলেখকগণের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার প্রস্তাবটির প্রতি পাঠকগণ মনোযোগ করিবেন।

ইতিহাসের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা বড়ো কঠিন। কথা সজীব পদার্থের মতো বাড়িয়া চলে; মুখে মুখে কালে কালে তাহার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। সৃজনশক্তি মানুষের মনের স্বাভাবিক শক্তি— যে-কোনো ঘটনা, যে-কোনো কথা তাহার হস্তগত হয় তাহাকে সে অবিকৃত রাখিতে পারে না; কতকটা নিজের ছাঁচে ঢালিয়া তাহাকে গড়িয়া লয়। এইজন্য আমরা প্রত্যহই একটি ঘটনার নানা পাঠান্তর নানা লোকের নিকট পাইয়া থাকি।

কেহ কেহ এইরূপ প্রাত্যহিক ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ইতিহাসের সত্যতা সম্বন্ধে আগাগোড়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু একটি কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান, ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতি বহুতর লোকের মন হইতে প্রতিফলিত হইয়া আসে এবং সেই ঘটনার বিবরণে সাময়িক লোকের মনের ছাপ পড়িয়া যায়। তাহা হইতে ঘটনার বিশুদ্ধ সত্যতা আমরা না পাইতেও পারি, কিন্তু তৎসাময়িক অনেক লোকের মনে তাহা কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল সেটা পাওয়া যাইতে পারে।

অতীত সময়ের অবস্থা কেবল ঘটনার দ্বারা নির্ণয় হয় না, লোকের কাছে তাহা কিরূপ ঠেকিয়াছিল সেও একটা প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। অতএব ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতিতে, বাস্তব ঘটনার সহিত মানব-মন মিশ্রিত হইয়া, যে পদার্থ উদ্ভূত হয় তাহাই ঐতিহাসিক সত্য। সেই সত্যের বিবরণই মানবের নিকট চিরন্তনকৌতুকাবহ এবং শিক্ষার বিষয়।

---

১ বৈশাখ ১৩০৫ ২ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

এই বিচিত্র জনশ্রুতি এবং জীর্ণ উপকরণ -মূলক ইতিহাসে এমন অনেকটা অংশই থাকে যাহার প্রমাণ অপ্রমাণ ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। দুই সাক্ষীর মধ্যে কোন্ সাক্ষীকে বিশ্বাস করিব তাহা অনেক সময়ে কেবলমাত্র বিচারকের স্বভাব ও পূর্বসংস্কারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ইংরাজ সাক্ষী মিথ্যা বলে না, ইংরাজ জজ ইহা কতকটা স্বভাবত এবং কতকটা টানিয়াও বিশ্বাস করেন; এই প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস -বশত তাঁহারা অন্যদেশীয়দের প্রতি অনেক সময়ে অবিচার করিয়া থাকেন তাহা ইংরাজ ব্যতীত আর-সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

ইতিহাসে এইপ্রকার ব্যক্তিগত সংস্কারের লীলা যখন অবশ্যম্ভাবী তখন এই কথা সহজেই মনে উদয় হয়, আমরা ক্রমাগত বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা গঠিত ইতিহাস-পাঠের পীড়ন কেন সহ্য করিব? আমরা যে ইতিহাস সংকলন করিব তাহাও যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে এ আশা করি না, কিন্তু ইতিহাসের যে অংশ প্রমাণ অপেক্ষা ঐতিহাসিকের মানসিক প্রকৃতির উপর বেশি নির্ভর করে সে অংশে আমাদের স্বজাতীয় প্রকৃতির সৃজনকর্তৃত্ব আমরা দেখিতে চাই।

তাহা ছাড়া, ইতিহাস একতর্‌ফা না হইয়া দুইতর্‌ফা হইলে সত্য-নির্ণয় সহজ হয়। বিদেশী ঐতিহাসিক একভাবে সাক্ষী সাজাইবেন এবং স্বদেশী ঐতিহাসিক অন্যভাবে সাক্ষী সাজাইবেন— তাহাতে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের কাজের সুবিধা হয়।

যাহা হউক, বিদেশী-লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিনা প্রশ্নে, বিনা বিচারে গ্রহণ ও মুখস্থ করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ফার্স্ট্ প্রাইজ পাওয়া আমাদের গৌরবের বিষয় হইতেছে না। কোনো ইতিহাসই কোনো কালে প্রশ্ন ও বিচারের অতীত হইতে পারে না। য়ুরোপীয় ইতিহাসেও

ভূরি ভূরি চিরপ্রচলিত দৃঢ়নিবদ্ধ বিশ্বাস নব নব সমালোচনার দ্বারা তিরস্কৃত হইতেছে। আমাদের দেশীয় ইতিহাস হইতে মিথ্যা বাছিতে গেলে তাহার উজাড় হইবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করি।

লেখকমহাশয় আমাদের দেশীয় ইতিহাস-সমালোচন ও সংকলনের জন্য একটি ঐতিহাসিক সভা -স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

আমাদের দেশে সভাস্থাপনের প্রতি আমাদের বড়ো-একটা বিশ্বাস নাই। লেখকমহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে আমাদের দেশের মাটিতে শিব গড়িতে গিয়া কিরূপ লজ্জা পাইতে হয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সভা-নামক বড়ো শিব গড়িতে গিয়া আরো কি বড়ো প্রহসনের সম্ভাবনা নাই!

যে দেশে কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে অনেকগুলি লোকের সুদৃঢ় উৎসাহ আছে সেই দেশে উৎসাহী লোকেরা একত্র হইয়া বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন। যে দেশে উৎসাহী লোক স্বল্প সে দেশে সভা করিতে গেলে ঠিক বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। কারণ, সে সভায় অধিকাংশ বাজে লোক জুটিয়া উৎসাহী লোকের উদ্যম খর্ব করিয়া দেয় মাত্র।

আমরা লেখকমহাশয় এবং তাঁহার দুই-চারিজন সহযোগীর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রতিই লক্ষ করিয়া আছি। তাঁহারা নিজেদের উৎসাহের উদ্যমে ভুলিয়া যাইতেছেন যে, দেশের লোকের অধিকাংশের মনে এ-সকল বিষয়ে অকৃত্রিম অনুরাগ নাই। অতএব তাঁহারা প্রথমে নিজের রচনা ও দৃষ্টান্ত -দ্বারা দেশে ইতিহাসানুরাগ বিস্তার করিয়া দিলে যথাসময়ে সভাস্থাপনের সময় হইবে।

সমবেত চেষ্টার জন্য উৎসাহী অনুরাগী লোক মাত্রেরই মন কাঁদে। মানুষ কাজ করিবার যন্ত্র নহে— অন্য পাঁচজন মানুষের সহিত মিশিয়া পাঁচজনের সহানুভূতি সমাদর ও উৎসাহ -দ্বারা বললাভ প্রাণলাভ করিতে হয়;

জনহীন শূন্য সভায় একা দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র কর্তব্য করিয়া যাওয়া বড়ো কঠিন। কিন্তু বাংলাদেশে যাঁহারা কোনো মহৎ কার্যের ভার লইবেন, লোকসঙ্গ লোকসাহায্যের সুখ তাঁহাদের অদৃষ্টে নাই।

বিনা আড়ম্বরে, বিনা ঘোষণায়, 'ঐতিহাসিক চিত্রাবলী' -নামক যে-কয়েকটি মূল্যবান্ ইতিহাসগ্রন্থ বাংলায় বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাই আমাদের বিপুল আশার কারণ। যাঁহারা 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, সভার দ্বারা তেমন কাজ হয় না প্রতিভার দ্বারা যেমন হয়।

সিরাজদ্দৌলা

স্কুলে যাঁহাদিগকে ইতিহাস মুখস্থ করিতে হইয়াছে তাঁহাদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, ভারত-ইতিবৃত্তে ইংরাজ শাসনকালের বিবরণ সর্বাপেক্ষা নীরস। তাহার একটা কারণ, এই বিবরণে মানবস্বভাবের লীলা পরিস্ফুট দেখা যায় না। —গবর্নর আসিলেন, যুদ্ধ হইল, জয়পরাজয় হইল, আইন হইল, পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল, গবর্নর চলিয়া গেলেন!

অবশ্য, ব্যাপারটা সত্যই এমন সম্পূর্ণ হৃদয়সম্পর্কশূন্য কলের কাণ্ড নহে। ভারত-শতরঞ্চ-মঞ্চে সাদা ও কালো ঘরে নানা পক্ষে যে-সকল বিচিত্র চাল চালিতেছিলেন, তাহার মধ্যে ভুলভ্রান্তি রাগদ্বেষ লোভমোহের হাত ছিল না এমন নহে। কিন্তু রাজভক্তি ও পাঠ্যসমিতির প্রতি লক্ষ রাখিয়া লেখক-দিগকে সংকীর্ণ সীমায় সভয়ে পদক্ষেপ করিতে হয়। সেইজন্য অন্তত বাংলায় রচিত ইতিহাসে ইংরাজ-শাসনের অধ্যায় অত্যন্ত শুষ্ক এবং শীর্ণ।

আরও একটা কথা আছে। মোগল-পাঠানের সময় প্রত্যেক সম্রাট্ স্বতন্ত্র প্রভুরূপে স্বেচ্ছামতে রাজ্যশাসন করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছার আন্দোলনে ভারত-ইতিবৃত্তে পদে পদে রসবৈচিত্র্য তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজের ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের শাসন। তাহার মধ্যে হৃদয়ের লীলা অত্যন্ত গৌণ ব্যাপার। মানুষ নাই, রাজা নাই, কেবল একটা পলিসি অতি দীর্ঘ পথ দিয়া ডাক বসাইয়া চলিয়াছে, প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর তাহার বাহক বদল হয় মাত্র।

সেই পলিসি কিরূপ সূক্ষ্ম জটিল সুদূরব্যাপী, এই মাকড়সাজালের সূত্রগুলি জিব্রণ্টার ইজিপ্ট্ এডেন প্রভৃতি দেশ দেশান্তর হইতে লম্বমান হইয়া কেমন করিয়া ভারতবর্ষকে আপাদমস্তক ছাঁকিয়া ধরিয়াছে, তাহার বিবরণ আমাদের পক্ষে কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই— এবং সেই বিবরণ

লায়াল সাহেবের 'ভারতসাম্রাজ্য' গ্রন্থে যেমন সংক্ষেপে ও মনোরম আকারে বিবৃত হইয়াছে এমন আর কোথাও দেখি নাই।

কিন্তু এই বিবরণ মানববুদ্ধির নৈপুণ্যব্যঞ্জক ঐতিহাসিক যন্ত্রতত্ত্ব—তাহা পাঠকের চিরকৌতুকাবহ ঐতিহাসিক হৃদয়তত্ত্ব নহে। পশ্চিমদেশের কল পূর্বদেশে কিরূপ পুতুলবাজি করাইতেছে তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ হাস্যরস, কিঞ্চিৎ করুণরস এবং প্রভূত পরিমাণে বিস্ময়রস আছে; কিন্তু প্রত্যক্ষ হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের সংঘর্ষে যে নাট্যরসভূয়িষ্ঠ সাহিত্যের উপাদান জন্মে ইহাতে তাহা স্বল্প।

ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে সেই ঐতিহাসিক উপন্যাস -রস, ইংরাজিতে যাহাকে রোম্যান্স্ বলে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তখন ইংরাজের স্বাভাবিক-দূরদর্শী রাজ্যবিস্তারনীতির মধ্যেও ব্যক্তিগত স্বার্থ-লোভ রাগদ্বেষের লীলায় ইতিহাসকে চঞ্চল ও উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থে ঐতিহাসিক রহস্যের যেখানে যবনিকা উত্তোলন করিয়াছেন সেখানে মোগল-সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ প্রাসাদদ্বারে ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় অত্যন্ত দীনভাবে দণ্ডায়মান। তখন ভারতক্ষেত্রে সংহারশক্তি যতপ্রকার বিচিত্র বেশে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাধু শান্ত ও দরিদ্র বেশ ছিল ইংরাজের। মারাঠি অশ্বপৃষ্ঠে দিগ্‌দিগন্তরে কালানল জ্বালাইয়া ফিরিতেছিল, শিখ ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে আপন দুর্জয় শক্তিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিতেছিল, মোগল সম্রাটের রাজপ্রতিনিধিগণ সেই যুগান্তরের সন্ধ্যাকাশে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রোহের রক্তধ্বজা আন্দোলন করিতেছিল— কেবল কয়েকজন ইংরাজ সওদাগর বাণিজ্যের বস্তা মাথায় করিয়া সম্রাটের প্রাসাদসোপানে প্রসাদচ্ছায়ায় অত্যন্ত বিনম্রভাবে আশ্রয় লইয়াছিল।

মাতামহ আলিবর্দির ক্রোড়ে নবাব-রাজহর্ম্যে সিরাজদ্দৌলা যখন শিশু তখন ভাবী ইংরাজ-রাজমহিমাও কলিকাতায় সওদাগরের কুঠিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অসহায় শিশুলীলা যাপন করিতেছিল। উভয়ের মধ্যে একটি অদৃষ্ট বন্ধন বাঁধিয়া দিয়া ভবিতব্যতা আপন নিদারুণ কৌতুক গোপন করিয়া রাখিয়াছিল।

প্রমোদের মোহমত্ততায় এই প্রলয়নাট্যের আরম্ভ হইল। ভাগীরথীতটে হীরাঝিলের নিকুঞ্জবনে বিলাসিনীর কলকণ্ঠ এবং নর্তকীর নূপুরধ্বনি মুখরিত হইয়া উঠিল। লালসার লুব্ধহস্ত গৃহস্থের রুদ্ধগৃহের মধ্যেও প্রসারিত হইল।

এ দিকে নেপথ্যে মাঝে মাঝে বর্গিদলের অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনা যায়, অস্ত্রঝঞ্চনা বাজিয়া উঠে। তাহাদের আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য বৃদ্ধ আলিবর্দি দশ দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এই উৎপাতের সুযোগে ইংরাজ বণিক কাশিমবাজারে একটি দুর্গ ফাঁদিল এবং স্থানে স্থানে আত্ম-রক্ষার উপযোগী সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিল।

বণিকদের স্পর্ধাও বাড়িতে লাগিল। তাহারা দেশী-বিদেশী মহাজন-দিগের নৌকা জাহাজ লুঠতরাজ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কোম্পানির কর্মচারীগণ আত্মীয়বন্ধুবান্ধব-সহ বিনাশুল্কে নিজ হিসাবে বাণিজ্য চালাইতে প্রবৃত্ত হইল।

এমন সময়ে সিরাজদ্দৌলা যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং ইংরাজের স্বেচ্ছাচারিতা দমন করিবার জন্য কঠিন শাসন বিস্তার করিলেন।

রাজমর্যাদাভিমানী নবাবের সহিত ধনলোলুপ বিদেশী বণিকের দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিল। এই দ্বন্দ্বে বণিক-পক্ষে গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। সিরাজদ্দৌলা যদিচ উন্নতচরিত্র মহৎ ব্যক্তি ছিলেন না, তথাপি এই দ্বন্দ্বের হীনতা মিথ্যাচার প্রতারণার উপরে তাঁহার সাহস ও সরলতা,

বীর্য ও ক্ষমা, রাজোচিত মহত্ত্বে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। তাই ম্যালিসন তাঁহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'সেই পরিণামদারুণ মহানাটকের প্রধান অভিনেতাদের মধ্যে সিরাজদ্দৌলাই একমাত্র লোক যিনি প্রতারণা করিবার চেষ্টা করেন নাই।'

দ্বন্দ্বের আরম্ভটি পত্রযুগলসমন্বিত তরুর অঙ্কুরের ন্যায় ক্ষুদ্র ও সরল, কিন্তু ক্রমশ নানা লোক ও নানা মতলবের সমাবেশ হইয়া তাহা বৃহৎ বনস্পতির ন্যায় বিস্তৃত ও জটিল হইয়া পড়িল।

নিপুণ সারথি যেমন এক কালে বহু অশ্ব যোজনা করিয়া রথ চালনা করিতে পারে, অক্ষয়বাবু তেমনি প্রতিভাবলে এই বহুনায়কসংকুল জটিল দ্বন্দ্ববিবরণকে আরম্ভ হইতে পরিণাম পর্যন্ত সবলে অনিবার্যবেগে ছুটাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ভাষা যেরূপ উজ্জ্বল ও সরস, ঘটনাবিন্যাসও সেইরূপ সুসংগত, প্রমাণবিশ্লেষণও সেইরূপ সুনিপুণ। যেখানে ঘটনাসকল বিচিত্র এবং নানাভিমুখী, প্রমাণসকল বিক্ষিপ্ত, এবং পদে পদে তর্কবিচারের অবতারণা আবশ্যক হইয়া পড়ে, সেখানে বিষয়টির সমগ্রতা সর্বত্র রক্ষা করিয়া তাহাকে ক্ষিপ্রগতিতে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া ক্ষমতাশালী লেখকের কাজ। বিশেষত প্রমাণের বিচারে গল্পের সূত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, কিন্তু সেই-সকল অনিবার্য বাধা-সত্ত্বেও লেখক তাঁহার ইতিবৃত্তকে কাহিনীর ন্যায় মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন, এবং ইতিহাসের চিরাপরাধী-অপবাদ-গ্রস্ত দুর্ভাগা সিরাজদ্দৌলার জন্য পাঠকের করুণা উদ্দীপন করিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছেন।

কেবল একটা বিষয়ে তিনি ইতিহাস-নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন। গ্রন্থকার যদিচ সিরাজ-চরিত্রের কোনো দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করেন

নাই, তথাপি কিঞ্চিৎ উদ্যম-সহকারে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। শান্তভাবে কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্য-দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও আবেগের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদৃঢ় প্রতিকূল সংস্কারের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া এবং প্রচলিত বিশ্বাসের অন্ধ অন্যায়পরতার দ্বারা পদে পদে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি স্বভাবতই এইরূপ বিচলিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে সত্যের শান্তি নষ্ট হইয়াছে এবং পক্ষপাতের অমূলক আশঙ্কায় পাঠকের মনে মধ্যে মধ্যে ঈষৎ উদ্‌বেগের সঞ্চার করিয়াছে।

২

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'সিরাজদ্দৌলা' পাঠ করিয়া কোনো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বজাতি সম্বন্ধে পরের নিকট হইতে নিন্দোক্তি শুনিলে ক্রোধ হইতেই পারে। সমূলক হইলেও।

কিন্তু আমাদের সহিত উক্ত পত্রসম্পাদকের কত প্রভেদ! আমাদিগকে বিদেশীলিখিত নিন্দোক্তি বাধ্য হইয়া অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু অক্ষয়বাবুর সিরাজদ্দৌলা কোনো কালে সম্পাদকমহাশয়ের সন্তানবর্গের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত হইবার সম্ভাবনা দেখি না। বিশেষত অক্ষয়বাবু এই গ্রন্থ যখন বাংলায় রচনা করিয়াছেন তখন ইংরাজ পাঠককে ব্যথিত করিবার সম্ভাবনা আরও সুদূরপরাহত হইয়াছে।

কিন্তু এই বাংলা রচনাতেই সমালোচক আক্রোশের কারণ আরও দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি আশঙ্কা করেন, ভাষানভিজ্ঞতাবশত যে-

সকল বাঙালি পাঠকের নিকট মূল দলিল এবং ঐতিহাসিক প্রমাণসকল আয়ত্তাতীত, 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থ পাঠে ইংরাজদিগের আচরণের প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধা জন্মিতে পারে।

কিন্তু, ইহা ইতিহাস; যুক্তির দ্বারা, প্রমাণের দ্বারা ইহাকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া দেওয়া কঠিন নহে। এমন-কি, আইনের কোনো অভাবনীয় ব্যাখ্যায় ইতিহাস-সমেত ঐতিহাসিককেও লোপ করিয়া দেওয়া অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু, জিজ্ঞাস্য এই যে, তুলনায় কোন্‌টা গুরুতর— ইংরাজ লেখকগণ গল্পে প্রবন্ধে ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রাচ্যজাতীয়দের প্রতি নানা আকারে যে নিন্দা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন, যাহা অধিকাংশ স্থলেই যুক্তিগত তথ্যগত নহে, জাতীয় সংস্কারগত— অধিকাংশ স্থলেই যাহার সুগভীর মূল-কারণ স্পেক্‌টেটর যাহাকে বলিয়াছেন 'the dislike for aliens'— ইহাই ? অথবা বাংলা ইতিহাস, যাহা শিক্ষিত বাঙালিদেরও বারো আনা লোক বাংলায় লিখিত বলিয়াই পড়িতে অনাদর করিবে, তাহা ?

আমাদের প্রতি ইংরাজের যে ধারণা জন্মিয়া থাকে তাহার ফল প্রত্যক্ষ— কারণ, আমরা নিরুপায়ভাবে ইংরাজের হস্তগত। একে দুর্বল অধীন আজ্ঞাবহের প্রতি স্বভাবতই উপেক্ষা জন্মে এবং সেই উপেক্ষা সদ্‌বিচারের ব্যাঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না, তাহার পরে শিশুকাল হইতে ইংরাজ-সন্তান যে-সকল গ্রন্থ পাঠ করে তাহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বীভৎসা এবং বিভীষিকার উদ্রেক করিয়া দেয়। ভারতবর্ষের ধর্ম সমাজ এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে ভূয়োভূয়ঃ কাল্পনিক মিথ্যাবাদ ও অত্যুক্তি -দ্বারা পরিপূর্ণ ইংরাজি গ্রন্থের পত্রসংখ্যার সহিত তুলিত হইলে বঙ্গসাহিত্যের ভালোমন্দ পাঠ্য-অপাঠ্য সমস্ত গ্রন্থ আপন ক্ষীণতাক্ষোভে লজ্জিত হইয়া উঠে।

ইংরাজ আমাদের ক্ষমতাশালী প্রভু। সেই ক্ষমতা ও প্রভাবের প্রত্যক্ষ আকর্ষণ অত্যন্ত অধিক। এত অধিক যে, অন্যায় ও অত্যাচারও যদি ঘটে তথাপি তাহা দুর্বল ব্যক্তিদিগকে ভয়ে বিস্ময়ে এবং একপ্রকার অন্ধ আসক্তিতে অভিভূত করিয়া রাখে। অতএব দেড় শত বৎসর পূর্বে ইংরাজ বণিক তৎকালীন রাজস্থানীয়দের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া ইংরাজের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে থাকিবে এমন ভারতবাসী নাই। মুখে যাহাই বলি, কোনোদিন বিশেষ আঘাতের ক্ষোভে বিশেষ কারণে যেমনই তর্ক করি, ইংরাজের প্রবল প্রতাপের আকর্ষণ ছেদন করা আমাদের পক্ষে সহজ নহে।

অতএব, যতদিন আমরা দুর্বল এবং ইংরাজ সবল ততদিন আমাদের মুখের নিন্দায় তাঁহাদের ক্ষতি নাই বলিলেই হয়, তাঁহাদের মুখের নিন্দা আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক। ততদিন আমাদের সংবাদপত্র কেবল তাঁহাদের ও তাঁহাদের মেমসাহেবদের কর্ণপীড়া উৎপাদন করে মাত্র এবং তাঁহাদের সংবাদপত্র আমাদের মর্মস্থানের উপর বন্দুকের গুলি বর্ষণ করে।

কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যে একটা অন্যায় আচরিত হয় বলিয়া আমরা তাহার অন্যায় প্রতিশোধ লইব ইহা সুযুক্তির কথা নহে— বিশেষত দুর্বলের পক্ষে সবলের অনুকরণ ভয়াবহ।

ইংরাজের অন্যায় নিন্দা 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তবে এমন একটা প্রসঙ্গের উত্থাপন করায় কী প্রয়োজন ছিল! সেই প্রয়োজনীয়তা সমালোচক ঠিকভাবে বুঝিবেন এবং যথার্থভাবে গ্রহণ করিবেন কি না সন্দেহ।

ঘাতপ্রতিঘাতের একটা স্বাভাবিক নিয়ম আছে। প্রাচ্য চরিত্র, প্রাচ্য শাসননীতি সম্বন্ধে ইংরাজি গ্রন্থে ছোটো-বড়ো, স্পষ্ট-অস্পষ্ট, সংগত-

অসংগত অজস্র কটূক্তি পাঠ করিয়া শিক্ষিত-সাধারণের মনে যে-একটা অবমাননাজনিত ক্ষোভ জন্মিতে পারে এ কথা অল্প ইংরাজই কল্পনা করেন।

অথচ, প্রথমশিক্ষাকালে ইংরাজের গ্রন্থ আমরা বেদবাক্যস্বরূপ গ্রহণ করিতাম। তাহা আমাদিগকে যতই ব্যথিত করুক তাহার যে প্রতিবাদ সম্ভবপর, তাহার যে প্রমাণ-আলোচনা আমাদের আয়ত্তগত এ কথা আমাদের বিশ্বাস হইত না। নীরবে নতশিরে আপনাদের প্রতি ধিক্কার-সহকারে সমস্ত লাঞ্ছনাকে সম্পূর্ণ সত্যজ্ঞানে বহন করিতে হইত।

এমন অবস্থায় আমাদের দেশের যে-কোনো কৃতী গুণী ক্ষমতাশালী লেখক সেই মানসিক বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে অন্ধ অনুবৃত্তি হইতে মুক্তিলাভের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছেন, তিনি আমাদের দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাপাত্র।

তাহা ছাড়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে আমাদের ভাগে যে কেবলই কলঙ্ক সেটা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা এবং বিরুদ্ধ প্রমাণ আনয়ন করা আমাদের নতশির ক্ষতহৃদয়ের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

অক্ষয়বাবু যে অন্ধকূপহত্যার সহিত গ্লেন্‌কোর হত্যাকাণ্ড ও সিপাহি-বিদ্রোহ-কালে অমৃতসরের নিদারুণ নিধন-ব্যাপারের তুলনা করিয়াছেন ইতিহাসবিবৃতিস্থলে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে এবং ইংরাজ সমালোচকের তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাতও সংগত হইতে পারে, কিন্তু আমরা ইহাকে নিরর্থক বলিতে পারি না। এইজন্য পারি না যে, যে-সকল সমূলক অমূলক ও অতিরঞ্জিত বিবরণ পাঠ করিয়া প্রাচ্য-চরিত্রের নির্দয় বর্বরতায় ইংরাজ-সন্তানগণ বংশানুক্রমে কণ্টকিত হইয়া আসিতেছেন এবং উচ্চ ধর্মমঞ্চ হইতে আমাদের প্রতি ভর্ৎসনা উদ্যত করিয়া রাখিয়াছেন, অন্ধকূপহত্যা তাহার মধ্যে একটা প্রধান। সেই আঘাতের একটা প্রতিঘাত করিতে

না পারিলে আত্মাবমাননার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। সুযোগ বুঝিয়া এ কথা বলিবার প্রলোভন আমরা সম্বরণ করিতে পারি না যে, শত্রুর প্রতি অন্ধ হিংস্রতা বিকৃত মানবচরিত্রের পশুপ্রবৃত্তি, তাহা বিশেষ রূপে প্রাচ্য-চরিত্রের নহে। সমালোচকের ধর্মমঞ্চ কেবল একা কোনো জাতির নহে। অবসর পাইলে আমরাও তাহার উপর চড়িয়া বিচারক মহাশয়ের কলঙ্ককালিমায় তর্জনী নির্দেশ করিতে পারি। খৃস্টান-শাস্ত্রে বলে, পরকে বিচার করিলে নিজেকেও বিচারাধীনে আসিতে হয়। স্বীকার করি ইহা ইতিহাসনীতি নহে, কিন্তু ইহা স্বভাবের নিয়ম।

অবশ্য, ইহাও স্বভাবের নিয়ম যে, সবল দুর্বলকে যেমন স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তচিত্তে বিচার করিয়া থাকে, দুর্বল সবলকে তেমন করিয়া বিচার করিতে গেলে সবলের ভ্রূযুগল কুটিল এবং মুষ্টিযুগল উদ্যত হইয়া উঠিতে পারে। অক্ষয়বাবু হয়তো আদিম প্রকৃতির সেই রূঢ় নিয়মের অধীনে আসিয়াছেন, কিন্তু বাংলা ইতিহাসে তিনি যে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন সেজন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন।

সমালোচক-মহাশয় এ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, মুসলমান-রাজ্যকালে এরূপ গ্রন্থ অক্ষয়বাবু লিখিতে পারিতেন না। হয়তো পারিতেন না। মুসলমান-রাজ্যকালে বিজিত হিন্দুগণ প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, রাজস্বসচিব প্রভৃতি উচ্চতর রাজকার্যে অধিকারবান ছিলেন, কিন্তু কোনো নবাবি আমলে উক্ত নবাবের দেড়শতাব্দ-পূর্ববর্তী ইতিহাস, বাহিরের প্রমাণ ও অন্তরের বিশ্বাস -অনুসারে তাঁহারা হয়তো লিখিতে পারিতেন না। ইংরাজ-রাজত্বকালে অক্ষয়বাবু যদি সেই অধিকার লাভ করিয়া থাকেন তবে তাহা ইংরাজ-শাসনের গৌরব, কিন্তু তবে কেন সেই অধিকার ব্যবহারের জন্য সমালোচক-মহাশয় চক্ষু রক্তবর্ণ করিতেছেন? এবং যদি সে অধিকার

অক্ষয়বাবুর না থাকে, যদি তিনি আইনের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া থাকেন, তবে কেন সমালোচক-মহাশয় অধিকারদানের ঔদার্য লইয়া গৌরব প্রকাশ করিতেছেন ?

ফলত এই অধিকারের রেখা এতই ক্ষীণ সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে যে, যাঁহারা আইনের অণুবীক্ষণ নিপুণভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন তাঁহারাও সীমানির্ণয়ে মতভেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন— এমন অবস্থায় অন্তত আরও কিছুদিন এ সম্বন্ধে কোনো কথা না বলাই ভালো।

ঐতিহাসিক চিত্র

আমরা 'ঐতিহাসিক চিত্র'-নামক একখানি ঐতিহাসিক পত্রের মুদ্রিত প্রস্তাবনা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সম্পাদকতায় তাহা প্রকাশিত হইবে।

এই প্রস্তাবনায় লিখিত হইয়াছে—'আমাদের ইতিহাসের অনেক উপকরণ বিদেশীয় পরিব্রাজকগণের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ; তাহা বহু ভাষায় লিখিত বলিয়া আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত ও অনাদৃত। মুসলমান বা ইউরোপীয় সমসাময়িক ইতিহাস-লেখকগণ যে-সকল বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারও অদ্যাপি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। পুরাতন রাজবংশের কাগজপত্রের মধ্যে যে-সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে তাহার অনুসন্ধান লইবারও ব্যবস্থা দেখা যায় না।

'নানা ভাষায় লিখিত ভারতভ্রমণকাহিনী ও ইতিহাসাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ, অনুসন্ধানলব্ধ নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য, আধুনিক ইতিহাসাদির সমালোচনা এবং বাঙালী রাজবংশ ও জমিদারবংশের পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত করাই (এই প্রস্তাবিত পত্রের) মুখ্য উদ্দেশ্য।'

বাংলা সাহিত্যে আজকাল ইতিহাসের চর্চা বিশেষরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বিক্ষিপ্ত উদ্যমগুলিকে একত্র করিয়া একখানি ঐতিহাসিক পত্র বাহির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। উপযুক্ত সম্পাদক উপযুক্ত সময়ে এ কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন ইহা আমাদের আনন্দের বিষয়।

প্রাচীন গ্রীস রোম এবং আধুনিক প্রায় সকল সভ্যদেশেই ইতিহাসের প্রতি পক্ষপাত যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে ভারতবর্ষে কখনো তেমন ছিল না, ইহাতে বোধ করি দুই মত হইবে না। মান্ধাতার সমকালে আমাদের

দেশে হয়তো সবই ছিল— তখন টেলিগ্রাফ, রেলগাড়ি, বেলুন, ম্যাকসিম বন্দুক, ডার্‌উইনের অভিব্যক্তিবাদ এবং গ্যানো-রচিত প্রকৃতিবিজ্ঞান ছিল এমন অনেকে আভাস দিয়া থাকেন— কিন্তু তখন ইতিহাস ছিল না। থাকিলে এমন-সকল কথা অল্প শুনা যাইত।

কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষে, যে সময়ে রাজপুতদের জনবন্ধন দৃঢ় ছিল তখন তাহাদের মধ্যে, উপযুক্ত মাটিতে উপযুক্ত চাষের মতো ইতিহাস আপনি উদ্‌ভিন্ন হইয়া উঠিত।

আধুনিক ভারতে যখন হইতে মারাঠারা শিবাজীর প্রতিভাবলে এক জনসম্প্রদায়রূপে বজ্রের মতো বাঁধিয়া গিয়াছিল এবং সেই বজ্র যখন জীর্ণ মোগল-সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ-বেগে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তখন হইতে তাহাদের ইতিহাসরচনার স্বাভাবিক কারণ ঘটে। তাহাদের 'বখর' নাম -ধারী ইতিহাসগুলি প্রাচীন মহারাষ্ট্র -সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ।

শিখদের ধর্মগ্রন্থ এবং তাহাদের জনসম্প্রদায়গঠনের ইতিহাস একত্র সম্মিলিত। তাহাদের ধর্মমতে একেশ্বরবাদের মহান্ ঐক্য স্বভাবতই জাতীয় ঐক্যের কারণ হইয়াছিল। তাহারা যেমন ধর্মে এক তেমনি কর্মে এক, তেমনি বলে এক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের ধর্মগ্রন্থ একই কালে পুরাণ এবং ইতিহাস।

আসল কথা এই যে, জীবের ধর্ম যেমন বর্তমানে জীবনরক্ষা এবং ভবিষ্যতে বংশানুক্রমে আপনাকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা তেমনি যখন বহু-সংখ্যক বিচ্ছিন্ন লোককে কোনো-একটি বিশেষ মত বা ভাব বা ধারাবাহিক স্মৃতিপরম্পরা এক জীবন দিয়া এক জীব করিয়া তোলে তখন সে বহিঃশত্রুর আক্রমণে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে এবং ভবিষ্যৎ-অভিমুখে আপন

ব্যক্তিত্ব, আপন সম্প্রদায়গত ঐক্যকে প্রেরণ করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়া উঠে। ইতিহাস তাহার অন্যতম উপায়। এইজন্য কীটসমাজের পক্ষে বংশানুক্রমে প্রবালশৈলরচনার ন্যায় বিশেষ ঐক্যবদ্ধ জনসম্প্রদায়ের পক্ষে ইতিহাসরচনা প্রকৃতিগত ধর্ম।

শাস্ত্র-পুরাণ জনসমাজের সম্পূর্ণ ইতিহাস না হইলেও তাহা ধর্মসমাজের ইতিহাস। ধর্মমণ্ডলী আপন ধর্মের মহত্ত্ব সৌন্দর্য প্রাচীনতা সাধুদৃষ্টান্তমালা পুরাণে শাস্ত্রে গ্রথিত করিয়া ধর্মমতপ্রবাহকে অখণ্ড আকারে কাল হইতে কালান্তরে সঞ্চারিত করিয়া রাখে এবং সেই পুরাতন ঐক্যসূত্রে আপন সম্প্রদায়কে দূরকালবদ্ধ বৃহৎ এবং সুদৃঢ় করিয়া তোলে।

এইজন্য ঘটনার তথ্যতা রক্ষা করা পুরাণের উদ্দেশ্য নহে। তাহা কেবল ধর্মমত-ধর্মবিশ্বাসের ইতিবৃত্ত। তাহার কাল্পনিক অমূলক উক্তি-সকলও বর্ণিত ধর্মনীতির আদর্শকেই ব্যক্ত করে। সাময়িক ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণ তাহার লক্ষের মধ্যে পড়ে না।

কিন্তু লোকেরা যখন কেবল ধর্মসম্প্রদায় বলিয়া নহে, জনসম্প্রদায় বলিয়া আপনার ঐক্য অনুভব করে— কেবল ধর্মরক্ষা নহে, জনগত আত্মরক্ষা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া উঠে— তখন তাহারা কেবল বিশেষ মত বা বিশ্বাস নহে, পরন্তু আপনাদের ক্রিয়াকলাপকীর্তি সুখদুঃখ ও সাময়িক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতে থাকে।

যখন আর্যগণ প্রথম ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, যখন উদাসীন স্বাতন্ত্র্য তাঁহাদের আদর্শ ছিল না, যখন প্রাকৃতিক বাধা ও আদিম অনার্যের সহিত সংগ্রামে তাঁহাদিগকে সচেষ্ট দলবদ্ধ হইতে হইয়াছিল, যখন বীরপুরুষগণের স্মৃতি তাঁহাদিগকে বীর্যে উৎসাহিত করিত, তখন তাঁহাদের লিপিহীন সাহিত্যে ইতিহাসগাথার প্রাদুর্ভাব ছিল সন্দেহ নাই। সেই-সকল অতি-

পুরাতন খণ্ড-ইতিহাস বহুযুগ পরে মহাভারতে ও রামায়ণে নানা বিকার-সহকারে একত্র সংযোজিত হইয়াছিল।

কিন্তু প্রতিপদক্ষেপে যখন আর বন ছিল না এবং বনে যখন আর রাক্ষস ছিল না, যক্ষরক্ষকিন্নরগণ যখন দুর্গম পর্বতে নির্বাসিত হইয়া জনপ্রবাদে ক্রমশ অলৌকিক আকার ধারণ করিল, অর্জুনবিজয়ী কিরাতেশ্বর ধূর্জটি যখন দেবপদে উত্তীর্ণ হইলেন, প্রতিকূল প্রকৃতি এবং মানবের সংঘাত যখন দূর হইয়া গেল, যখন সুদীর্ঘ শান্তিকালে সূর্যকরোত্তপ্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ সকলের প্রধান হইয়া আপন ঔদাস্যধর্মের বিপুলজাল হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত নিক্ষেপ করিল, তখন হইতে আর ইতিহাস রহিল না। ব্রাহ্মণের ধর্ম শত শত নব নব পুরাণে গ্রথিত হইতে লাগিল, কিন্তু জনসংঘ ক্রমে শিথিলীভূত হইয়া কোথায় ছড়াইয়া পড়িল, তাহাদের আর কোনো কথাই নাই। অতীত হইতেও তাহারা বিচ্যুত হইল, ভবিষ্যতের সহিতও তাহাদের যোগ রহিল না।

আসল কথা, ঐক্যের ধর্ম প্রাণধর্মের ন্যায়। সে জড়ধর্মের ন্যায় কেবল একাংশে বদ্ধ থাকে না। সে যদি এক দিকে প্রবেশ লাভ করে তবে ক্রমে আর-এক দিকেও আপনার অধিকার বিস্তার করিতে থাকে। সে যদি দেশে ব্যাপ্ত হইতে পায় তবে কালেও ব্যাপ্ত হইতে চায়। সে যদি নিকট এবং দূরের মধ্যে বিচ্ছেদ পূরণ করিতে পারে তবে অতীত এবং ভবিষ্যতের সঙ্গেও আপন বিচ্ছিন্নতা দূর করিতে চেষ্টা করে।

এই অখণ্ডতার চেষ্টা এত প্রবল যে, অনেক সময়ে তাহা কল্পনার দ্বারা ইতিহাসের অভাব পূরণ করিয়া ইতিহাসকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। এইজন্যই সুদীর্ঘ কল্পনাজাল বিস্তার করিয়া রাজপুতগণ চন্দ্রসূর্যবংশের সহিত আপন সংযোগ সাধন করিয়াছিল।

আমরাও বর্ণ এবং কুল -মর্যাদা একটি সূক্ষ্ম সূত্রের মতো অনেক দিন হইতে টানিয়া লইয়া চলিয়াছি। তাহার শ্রেণী-গোত্র-গাঁই-মেল-সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত সাহিত্য ভাটেদের মুখে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা আমরা ভুলিতে দিতে পারি না। কারণ, আমাদের সমাজে যে ঐক্য আছে তাহা প্রধানত বর্ণগত। সেই সূত্র আমরা স্মরণাতীত কাল হইতে টানিয়া আনিতে এবং অনন্ত ভবিষ্যতের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে চাই।

কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি জনগত ঐক্য থাকিত— যদি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া জয়ের গৌরব, পরাজয়ের লজ্জা, উন্নতির চেষ্টা আমরা এক বৃহৎ হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিতাম, তবে সেই জনমণ্ডলী স্বভাবতই উর্ণনাভের মতো আপনার ইতিহাসতন্তু প্রসারিত করিয়া দূর-দূরান্তরে আপনাকে সংযুক্ত করিত। তাহা হইলে আমাদের দেশের ভাটেরা কেবল গাঁই-গোত্র-প্রবরের শ্লোক আওড়াইত না, কথকেরা কেবল পুরাণ ব্যাখ্যা করিত না, ইতিহাস-গাথকেরা পূর্বকালের সহিত সুখদুঃখগৌরবের যোগ বংশানুক্রমে স্মরণ করাইয়া রাখিত।

এক্ষণে আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ এই যে, সম্প্রতি বঙ্গসাহিত্যে যে-একটি ইতিহাস-উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে সার্বজনীন সুলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। তাহাকে আমরা আকস্মিক এবং ক্ষণস্থায়ী একটা বিশেষ ধরণের সংক্রামক রচনাকণ্ডু বলিয়া স্থির করিতে পারি না। আজকাল সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষা এবং আন্দোলনের যে জীবনশক্তি নানা আকারে কার্য করিতেছে, এই ইতিহাসক্ষুধা তাহারই একটি স্বাভাবিক ফল।

ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে, কন্‌গ্রেস প্রভৃতির বিক্ষোভ যে আমাদের দেশে বাহ্যিক তাহা নহে। এক-এক সময়ে মনে আশঙ্কা জন্মে যে,

রাজ-দরবারে প্রতিবৎসর একঘেয়ে দরখাস্ত পেশ করিবার এই যে-সকল বিপুল আয়োজন ইহা ব্যর্থ; কারণ, সরকারের নিকট ইহা প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারে নাই এবং দেশের অন্তরের মধ্যেও ইহার স্থায়ী প্রভাব প্রবেশ করিতেছে না।

কিন্তু আমাদের অন্তরের মধ্যে শক্তিপুঞ্জ কেমন করিয়া অলক্ষ্যে কাজ করিতেছে তাহাই আমরা সর্বাপেক্ষা অল্প জানি। যখন অঙ্কুর বাহির হইয়া পড়ে তখনই বুঝিতে পারি, বাতাসে কখন বীজ উড়িয়া আসিয়া মনের উর্বর প্রদেশে স্থানলাভ করিয়াছিল।

এই ইতিহাসবুভুক্ষা, ইহা একটি অঙ্কুর। বুঝিতেছি যে, কন্‌গ্রেস বৎসর বৎসর কেবল রাজপ্রাসাদে কতকগুলি বিফল দরখাস্ত বর্ষণ করে নাই, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে ক্রমশই ঘনিষ্ঠতর করিয়া আনিয়া আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে ভাবের বীজ বপন করিতেছে।

দেশব্যাপী বৃহৎহৃৎস্পন্দন কিছুদিন হইতে আমরা যেন অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ব্যক্তিগত পল্লীগত বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের সুখদুঃখ, আমাদের মান-অপমান, আমাদের চিন্তা, আমাদের চেষ্টা ক্রমেই বৃহৎ পরিধি আশ্রয় করিতেছে। জড়ীভূতা অহল্যা রামচন্দ্রের স্পর্শে যেমন ভূমিতল হইতে মূর্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল সেইরূপ একেশ্বর ইংরাজ-শাসনের সংস্পর্শে আমাদের ভারতবর্ষ বিমিশ্র অস্পষ্ট বিচ্ছিন্ন জড়পুঞ্জমধ্য হইতে ক্রমশ এক মূর্তি গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেছে। জনহৃদয়ে সঞ্চরমাণ সেই-যে ঐক্যের বেগ, প্রাণের উচ্ছ্বাস, প্রীতির বন্ধন-মুক্তি ও কর্তব্যের উদারতা-জনিত আনন্দ, তাহাই আমাদের উদ্যমকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এখন আমরা বোম্বাই মাদ্রাজ পঞ্জাবকে যেমন নিকটে পাইতে চাই

তেমনি অতীত ভারতবর্ষকেও প্রত্যক্ষ করিতে চাহি। নিজের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া এক্ষণে আমরা দেশে এবং কালে এক রূপে এবং বিরাট্ রূপে আপনাকে উপলব্ধি করিতে উৎসুক। এখন আমরা মোগল-রাজত্বের মধ্য দিয়া, পাঠান-রাজত্ব ভেদ করিয়া, সেনবংশ পালবংশ গুপ্তবংশের জটিল অরণ্যমধ্যে পথ করিয়া, পৌরাণিক কাল হইতে বৌদ্ধ কাল এবং বৌদ্ধ কাল হইতে বৈদিক কাল পর্যন্ত অখণ্ড আপনার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছি। সেই মহৎ আবিষ্কারব্যাপারের নৌযাত্রায় 'ঐতিহাসিক চিত্র' একটি তরণী। যে-সকল নির্ভীক নাবিক ইহাতে সমবেত হইয়াছেন ঈশ্বর তাঁহাদের আশীর্বাদ করুন, দেশের লোক তাঁহাদের সহায় হউন এবং বাধাবিঘ্ন ও নিরুৎসাহের মধ্যেও অনুরাগপ্রবৃত্ত মহৎকর্তব্যসাধনের নিষ্কাম আনন্দ তাঁহাদিগকে ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ না করুক।

এ কথা কেহ না মনে করেন, গৌরব-অনুসন্ধানের জন্য পুরাবৃত্তের দুর্গম পথে প্রবেশ করিতে হইবে। সে দিকে গৌরব না থাকিতেও পারে— অনেক পরাভব, অনেক অবমাননা, অনেক পতন ও বিকারের মধ্য দিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাস বহিয়া আসিয়াছে। অনেক স্থলে সেই এক-হাঁটু পঙ্কের ভিতর দিয়া আমাদিগকে হাঁটিতে হইবে। তবু আমাদিগকে এই পঙ্কিল জটিল বক্র পথের দিকে আকর্ষণ করিতেছে কে? জাতীয় আত্মশ্লাঘা নহে, স্বদেশের প্রতি নবজাগ্রত প্রেম। আমরা দেশকে প্রকৃতরূপে প্রত্যক্ষরূপে সম্পূর্ণরূপে জানিতে চাই— তাহার সমস্ত দুঃখদুর্দশা-দুর্গতির মধ্যেও তাহাকে লক্ষ্য করিতে চাই— আপনাকে ভুলাইতে চাই না।

তথাপি আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ইতিহাসের পথ বাহিয়া ভারতবর্ষকে যদি আমরা সমগ্রভাবে দেখিতে পাই আমাদের লজ্জা পাইবার কারণ ঘটিবে না।

তাহা হইলে আমরা এমন একটি নিত্য আদর্শ লাভ করিব যাহা ভারতবর্ষের আদর্শ, যাহা সকল পরাভব ও অবমাননার উর্ধ্বে আপন উচ্চশির অম্লান রাখিতে পারিয়াছে।

গ্রীক ও রোমকেরা বীর জাতি ছিল, বিজয়ী জাতি ছিল, তাহারা বহুকাল নির্ভয়ে প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া দেশ জয় ও দেশ রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা-রক্ষা তাহাদের জাতীয় লক্ষ্য ও গৌরব ছিল। কিন্তু সেই দৃঢ় আদর্শ, সেই বহুকালের সফলতা ও মহদ্দৃষ্টান্ত, তাহাদিগকে পতনের ও পরাভবের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।

ভারতবর্ষ নিজেকে যে পথে লইয়া গিয়াছিল তাহা কোনো কালেই দেশরক্ষা ও দেশজয়ের পথ নহে। অতএব বহিঃশত্রুর বাহুবলের নিকট ভারতবর্ষের যে পরাভব সে তাহার আত্ম-আদর্শের পরাভব নহে। অবশ্য, বাহিরের উপপ্লবে, শক গ্রীক আরব মোগল ও ভারতবর্ষীয় অনার্যদের সংঘাতে, ভারতবর্ষের তপোভঙ্গ হইয়াছিল; যে আদর্শের ঐক্য ক্রমশ অভিব্যক্ত হইয়া, বিক্ষিপ্ততা হইতে ক্রমশ সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ় হইয়া, হিন্দুজাতিকে একটি বিশেষ ভাবে ও গঠনে, শোভায় ও সামঞ্জস্যে সৃজন করিয়া তুলিতে পারিত, তাহা বারম্বার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিকীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি নানা বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়াও সেই মূলসূত্রটি অনুসরণ করিতে পারিলে হয়তো বুঝিতে পারিব, বর্তমান য়ুরোপের আদর্শ-দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পরিমেয় নহে।

য়ুরোপের আদর্শ য়ুরোপকে কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা আমরা কিছুই জানি না; তাহা যে স্থায়ী নহে, তাহার মধ্যে যে অনেক বিনাশের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। ভারতবর্ষ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে— য়ুরোপ প্রবৃত্তিকে লালন

করিয়া আত্মহত্যার উদ্‌যোগ করিতেছে। নিজদেশ এবং পরদেশের প্রতি আমাদের আসক্তি ছিল না বলিয়া বিদেশীর নিকট আমরা দেশকে বিসর্জন দিয়াছি— নিজদেশ ও পরদেশের প্রতি আসক্তি সযত্নে পোষণ করিয়া য়ুরোপ আজ কোন্ রক্তসমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! অস্ত্রে শস্ত্রে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত করিয়া তুলিয়া তাহার এ কী বিকট মূর্তি! কী সন্দেহ ও কী আতঙ্কের সহিত য়ুরোপের প্রত্যেক রাজশক্তি পরস্পরের প্রতি ক্রূর কটাক্ষপাত করিতেছে! রাজমন্ত্রীগণ টিপিয়া টিপিয়া পরস্পরের মৃত্যুচাল চালিতেছে; রণতরীসকল মৃত্যুবাণে পরিপূর্ণ হইয়া পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে যমদৌত্যে বাহির হইয়াছে। আফ্রিকায় আসিয়ায় য়ুরোপের ক্ষুধিত লুব্ধগণ আসিয়া ধীরে ধীরে এক-এক পা বাড়াইয়া একটা থাবায় মাটি আক্রমণ করিতেছে এবং আর-একটা থাবা সম্মুখের লোলুপ অভ্যাগতের প্রতি উদ্যত করিতেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার হিংসা ও লোভে অদ্য পৃথিবীর চারি মহাদেশ ও দুই মহাসমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার মহাজনদের সহিত মজুরদের, বিলাসের সহিত দুর্ভিক্ষের, দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির সহিত সোশ্যালিজ্‌ম্ ও নাইহিলিজ্‌ম্'এর দ্বন্দ্ব য়ুরোপের সর্বত্রই আসন্ন হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তির প্রবলতা, প্রভুত্বের মত্ততা, স্বার্থের উত্তেজনা কোনো কালেই শান্তি ও পরিপূর্ণতায় লইয়া যাইতে পারে না; তাহার একটা প্রচণ্ড সংঘাত, একটা ভীষণ রক্তাক্ত পরিণাম আছেই। অতএব য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে চরম আদর্শ বিবেচনাপূর্বক তদ্দ্বারা ভারতবর্ষকে মাপিয়া খাটো করিয়া ক্ষোভ পাইবার হয়তো প্রয়োজন নাই। একটা কথা আছে: জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ।

যেমন করিয়াই হউক এখন ভারতবর্ষকে আর পরের চোখে দেখিয়া আমাদের সান্ত্বনা নাই। কারণ, ভারতবর্ষের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি

জাগ্রত হইয়া উঠে নাই তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা বাহির হইতে দেখিতাম ; তখন আমরা পাঠান-রাজত্বের ইতিহাস, মোগল-রাজত্বের ইতিহাস পাঠ করিতাম। এখন সেই মোগল-রাজত্ব পাঠান-রাজত্বের মধ্যে ভারতেরই ইতিহাস অনুসরণ করিতে চাহি। ঔদাসীন্য অথবা বিরাগের দ্বারা তাহা কখনো সাধ্য নহে। সেই সমগ্র ধারণা কেবল বিচার ও গবেষণার দ্বারাও হইতে পারে না ; কল্পনা এবং সহানুভূতি আবশ্যক।

বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীকে এক করিতে ও মৃততথ্যগুলিতে জীবনসঞ্চার করিতে যখন কল্পনা ও সহানুভূতি নিতান্তই চাই তখন সে বিষয়ে আমরা পরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। সংগ্রহকার্যে পরের সহায়তা লইতে আপত্তি নাই, কিন্তু সৃজনকার্যে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হইলে পক্ষপাতের আশঙ্কা আছে, কিন্তু পক্ষপাত অপেক্ষা বিদ্বেষে ও সহানুভূতির অভাবে ইতিহাসকে ঢের বেশি বিকৃত করে। তাহা ছাড়া এক দেশের আদর্শ লইয়া আর-এক দেশে খাটাইবার প্রবৃত্তি বিদেশীর লেখনীমুখে আপনি আসিয়া পড়ে, তাহাতেও শুভ হয় না।

হউক বা না-হউক, আমাদের ইতিহাসকে আমরা পরের হাত হইতে উদ্ধার করিব, আমাদের ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখিব, সেই আনন্দের দিন আসিয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গকে লেথ্‌ব্রিজ সাহেবের চটির মধ্য হইতে বাহির করিয়া ইতিহাসের উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিব ; এখানে তাঁহারা নিজের চেষ্টায় সত্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি ভ্রমও সংগ্রহ করেন সেও আমাদের পক্ষে পর-লিখিত পরীক্ষাপুস্তকের মুখস্থ বিদ্যা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেয়, কারণ, সেই স্বাধীন চেষ্টার উদ্যম আর-একদিন সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবে। কিন্তু পরদত্ত চোখের ঠুলি

চিরদিন বাঁধা রাস্তায় ঘুরিবার যতই উপযোগী হউক, পরীক্ষার ঘানিবৃক্ষের তৈলনিষ্কাশনকল্পে যতই প্রয়োজনীয় হউক, নূতন সত্য-অর্জন ও পুরাতন ভ্রম-বিবর্জনের উদ্দেশে অব্যবহার্য।

'ঐতিহাসিক চিত্র' ভারত-ইতিহাসের বন্ধনমোচন-জন্য ধর্মযুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত। আশা করি ধর্ম তাহার সহায় হইয়া তাহাকে রক্ষা ও তাহার উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করিবেন। অথবা, ধর্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্।

ঐতিহাসিক চিত্র

সূচনা

ঐতিহাসিক চিত্রের সূচনা লিখিবার জন্য সম্পাদক-দত্ত অধিকার পাইয়াছি, আর কোনো প্রকারের অধিকারের দাবি রাখি না। কিন্তু আমাদের দেশের সম্পাদক ও পাঠকবর্গ লেখকগণকে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন তাহাতে অনধিকার প্রবেশকে আর অপরাধ বলিয়া জ্ঞান হয় না।

এই ঐতিহাসিক পত্রে আমি যদি কিছু লিখিতে সাহস করি তবে তাহা সংক্ষিপ্ত সূচনাটুকু। কোনো শুভ অনুষ্ঠানের উৎসব-উপলক্ষ্যে ঢাকীকে মন্ত্রও পড়িতে হয় না, পরিবেশনও করিতে হয় না— সিংহদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সে কেবল আনন্দধ্বনি ঘোষণা করিতে থাকে। সে যদিচ কর্তা-ব্যক্তিদের মধ্যে কেহই নহে, কিন্তু সর্বাগ্রে উচ্চকলরবে কার্যারম্ভের সূচনা তাহারই হস্তে।

যাঁহারা কর্মকর্তা, গীতা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে : কর্মণ্যে-বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। অর্থাৎ, কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কদাচ নাই। আমরা কর্মকর্তা নহি। আমাদের একটা সুবিধা এই যে, কর্মে আমাদের অধিকার নাই, কিন্তু ফলে আছে। সম্পাদক-মহাশয় যে অনুষ্ঠান ও যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন তাহার ফল বাংলার, এবং আশা করি অন্য দেশের, পাঠকমণ্ডলী চিরকাল ভোগ করিতে পারিবেন।

অদ্য 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র শুভ জন্মদিনে আমরা যে আনন্দ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা কেবলমাত্র সাহিত্যের উন্নতিসাধনের আশ্বাসে নহে। তাহার আরো একটি বিশেষ কারণ আছে।

পরের রচিত ইতিহাস নির্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং

পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া কৃতী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্‌যোগ সেই উদ্‌যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে, সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য— আমাদের প্রাণ।

বঙ্গদর্শনের প্রথম অভ্যুদয়ে বাংলাদেশের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, একটি সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যে বাংলার পাঠক-হৃদয় যেন কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আনন্দ স্বাধীন চেষ্টার আনন্দ। সাহিত্য যে আমাদের আপনাদের হইতে পারে, সেদিন তাহার ভালোরূপ প্রমাণ হইয়াছিল। আমরা সেদিন ইস্কুল হইতে, বিদেশী মাস্টারের শাসন হইতে, ছুটি পাইয়া ঘরের দিকে ফিরিয়াছিলাম।

বঙ্গদর্শন হইতে আমরা 'বিষবৃক্ষ' 'চন্দ্রশেখর, 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং বিবিধ ভোগ্য বস্তু পাইয়াছি, সে আমাদের পরম লাভ বটে। কিন্তু সকলের চেয়ে লাভের বিষয় সাহিত্যের সেই স্বাধীন চেষ্টা। সেই অবধি আজ পর্যন্ত সে চেষ্টার আর বিরাম হয় নাই। আমাদের সাহিত্যের ভাবী আশার পথ চিরদিনের উন্য উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গদর্শন আমাদের সাহিত্যপ্রাসাদের বড়ো সিংহদ্বারটা খুলিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার এক-একটি মহলের চাবি খুলিবার সময় আসিয়াছে। 'ঐতিহাসিক চিত্র' অদ্য 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-নামক একটা প্রকাণ্ড রুদ্ধবাতায়ন রহস্যাবৃত হর্ম্যশ্রেণীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

সম্পাদকমহাশয় তাঁহার প্রস্তাবনাপত্রে জানাইয়াছেন— 'নানা ভাষায় লিখিত ভারতভ্রমণকাহিনী এবং ইতিহাসাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, অনুসন্ধানলব্ধ নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য, আধুনিক ইতিহাসাদির

সমালোচনা এবং বাঙালী রাজবংশ ও জমিদারবংশের পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।'

এই তো প্রত্যক্ষ ফল। তাহার পর পরোক্ষ ফল সম্বন্ধে আশা করি যে, এই পত্র আমাদের দেশে ঐতিহাসিক স্বাধীন চেষ্টার প্রবর্তন করিবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিতে না পারিলে 'ঐতিহাসিক চিত্র' দীর্ঘকাল আপন মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না— সমস্ত দেশের সহকারিতা না পাইলে ক্রমে সংকীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া লুপ্ত হইবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিয়া যদি 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র মৃত্যু হয়, তথাপি সে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আশা করিতে পারি না, কিন্তু বাংলার প্রত্যেক জেলা যদি আপন স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক জমিদার যদি তাহার সহায়তা করেন এবং বাংলার রাজবংশের পুরাতন দপ্তরে যে-সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে 'ঐতিহাসিক চিত্র' তাহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে, তবেই এই ত্রৈমাসিক পত্র সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে।

এখন সংগ্রহ এবং সমালোচনা ইহার প্রধান কাজ। সমস্ত জনশ্রুতি, লিখিত এবং অলিখিত, তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা— এই পত্রভাণ্ডারে সংগ্রহ হইতে থাকিবে। যাহা তথ্য-হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাস-রূপে প্রচলিত, তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায়। কারণ, ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস। আমরা একান্ত আশা করিতেছি, এই সংগ্রহকার্যে 'ঐতিহাসিক চিত্র' সমস্ত দেশকে আপন সহায়তায় আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিবে।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র শ্রমকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে— বন্ধ্য এবং অবন্ধ্য (productive এবং unproductive)। বিলাসসামগ্রী যে শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন তাহাকে বন্ধ্য বলা যায় ; কারণ, ভোগেই তাহার শেষ, তাহা কোনোরূপে ফিরিয়া আসে না। আমরা আশা করিতেছি, 'ঐতিহাসিক চিত্র' যে শ্রমে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহা বন্ধ্য হইবে না, কেবলমাত্র কৌতূহলপরিতৃপ্তিতেই তাহার অবসান নহে। তাহা দেশকে যাহা দান করিবে তাহার চতুর্গুণ প্রতিদান দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে, একটি বীজ রোপণ করিয়া তাহা হইতে সহস্র শস্য লাভ করিতে থাকিবে।

আমাদের দেশ হইতে রূঢ় দ্রব্য বিলাতে গিয়া সেখানকার কারখানায় কারুপণ্যে পরিণত হইয়া এ দেশে বহুমূল্যে বিক্রীত হয়— তখন আমরা জানিতেও পারি না তাহার আদিম উপকরণ আমাদের ক্ষেত্র হইতেই সংগৃহীত। যখন দেশের কোনো মহাজন এইখানেই কারখানা খোলেন তখন সেটাকে আমাদের সমস্ত দেশের একটা সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া জ্ঞান করি।

ভারত-ইতিহাসের আদিম উপকরণগুলি প্রায় সমস্তই এখানেই আছে ; এখনো যে কত নূতন নূতন বাহির হইতে পারে তাহার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু, কি বাণিজ্যে, কি সাহিত্যে, ভারতবর্ষ কি কেবল আদিম উপকরণেরই আকর হইয়া থাকিবে? বিদেশী আসিয়া নিজের চেষ্টায় তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজের কারখানায় তাহাকে না চড়াইলে আমাদের কোনো কাজেই লাগিবে না?

'ঐতিহাসিক চিত্র' ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্বদেশী কারখানা-স্বরূপ খোলা হইল। এখনো ইহার মূলধন বেশি জোগাড় হয় নাই, ইহার

কল-বলও স্বল্প হইতে পারে, ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও প্রথম প্রথম কিছু মোটা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা দেশের যে গভীর দৈন্য— যে মহৎ অভাব -মোচনের আশা করা যায় তাহা বিলাতের বস্তা বস্তা সূক্ষ্ম ও সুনির্মিত পণ্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত। প্রথম খণ্ড। শ্রীআবদুল করিম বি. এ. -প্রণীত

ভারতবর্ষে মুসলমান-প্রবেশের অনতিপূর্বে খৃস্টশতাব্দীর আরম্ভকালে ভারত-ইতিহাসে একটা রোমাঞ্চকর মহাশূন্যতা দেখা যায়। দীর্ঘ দিবসের অবসানের পর একটা যেন চেতনাহীন সুষুপ্তির অন্ধকার সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল— সেটুকু সময়ের কোনো জাগ্রত সাক্ষী, কোনো প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। গ্রীক এবং শকগণের সহিত সংঘাত তাহার পূর্বেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যে দ্বন্দ্বসংঘাতে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য শালিবাহন সমস্ত ভারতবর্ষের চূড়ার উপরে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন তাহা কেমন করিয়া একেবারে শান্ত নিরস্ত নিস্তরঙ্গ হইয়াছিল। নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে কোনো মহৎ ব্যক্তি বা বৃহৎ উদ্‌বোধনের আবির্ভাব হয় নাই। মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস-যবনিকা সবলে ছিন্ন করিয়া উদ্‌ঘাটন করিল তখন রাজপুত-নামক এক আধুনিক সম্প্রদায় দেশের সমুদয় উচ্চ স্থানগুলি অধিকার করিয়া মান-অভিমানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধে দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিতেছিল। সে জাতি কখন গঠিত হইল, কখন প্রবল হইল, কখন পঞ্জাব হইতে পূর্বদেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইল, তাহারা কাহাকে দূরীকৃত করিয়া কাহার স্থান অধিকার করিল, তাহা সমস্তই ভারতবর্ষের সেই ঐতিহাসিক অন্ধরজনীর কাহিনী, তাহার আনুপূর্বিকতা প্রচ্ছন্ন। মনে হয় ভারতবর্ষ তদানীং সহসা কোথা হইতে একটা নিষ্ঠুর আঘাত, একটা প্রচণ্ড বেদনা পাইয়া নিঃশব্দ মূর্ছিত হইয়া ছিল। তাহার পর হইতে আর সে নিজের পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পায় নাই ; আর তাহার বীণায় সংগীত বাজে নাই, কোদণ্ডে টংকার জাগে নাই, নির্বাণহোমাগ্নি তপোবনে ঋষিললাট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা উদ্‌ভাসিত হয় নাই।

এ দিকে অনতিপূর্বে ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বহুতর খণ্ডবিচ্ছিন্ন জাতি

মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচণ্ড আকর্ষণবলে একীভূত হইয়া মুসলমান-নামক এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। তাহারা যেন ভিন্ন ভিন্ন দুর্গম মরুময় গিরিশিখরের উপরে খণ্ড তুষারের ন্যায় নিজের নিকটে অপ্রবুদ্ধ এবং বাহিরের নিকটে অজ্ঞাত হইয়া বিরাজ করিতেছিল। কখন্ প্রচণ্ড সূর্যের উদয় হইল এবং দেখিতে দেখিতে নানা শিখর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তুষারস্রুত বন্যা একবার একত্রে স্ফীত হইয়া তাহার পরে উন্মত্ত সহস্র ধারায় জগৎকে চতুর্দিকে আক্রমণ করিতে বাহির হইল!

তখন শ্রান্ত পুরাতন ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম বৌদ্ধদের দ্বারা পরাস্ত; এবং বৌদ্ধধর্ম বিচিত্র বিকৃত রূপান্তরে ক্রমশ পুরাণ-উপপুরাণের শতধা-বিভক্ত ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বক্র প্রণালীর মধ্যে স্রোতোহীন মন্দগতিতে প্রবাহিত হইয়া একটি সহস্রলাঙ্গুল শীতরক্ত সরীসৃপের ন্যায় ভারতবর্ষকে শতপাকে জড়িত করিতেছিল। তখন ধর্মে সমাজে শাস্ত্রে কোনো বিষয়ে নবীনতা ছিল না, গতি ছিল না, বৃদ্ধি ছিল না, সকল বিষয়েই যেন পরীক্ষা শেষ হইয়া গেছে, নূতন আশা করিবার বিষয় নাই। সে সময়ে নূতনসৃষ্ট মুসলমান জাতির বিশ্ববিজয়োদ্দীপ্ত নবীন বল সম্বরণ করিবার উপযোগী কোনো-একটা উদ্দীপনা ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল না।

নবভাবোৎসাহে এবং ঐক্যপ্রবণ ধর্মবলে একটা জাতি যে কিরূপ মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি লাভ করে পরবর্তীকালে শিখগণ তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল।

কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, নিরুৎসুক হিন্দুগণ মরিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মুসলমানেরা যুদ্ধ করিয়াছে, আর হিন্দুরা দলে দলে আত্মহত্যা করিয়াছে। মুসলমানদের যুদ্ধের মধ্যে এক দিকে ধর্মোৎসাহ, অপর দিকে রাজ্য অথবা অর্থ -লোভ ছিল; কিন্তু হিন্দুরা চিতা জ্বালাইয়া স্ত্রীকন্যা ধ্বংস করিয়া আবালবৃদ্ধ মরিয়াছে, মরা উচিত বিবেচনা করিয়া, বাঁচা তাহাদের

শিক্ষাবিরুদ্ধ সংস্কারবিরুদ্ধ বলিয়া। তাহাকে বীরত্ব বলিতে পারো, কিন্তু তাহাকে যুদ্ধ বলে না। তাহার মধ্যে উদ্দেশ্য অথবা রাষ্ট্রনীতি কিছুই ছিল না।

শাস্ত্রের উপদেশই হউক বা অন্য কোনো ঐতিহাসিক কারণ অথবা জল-বায়ু-ঘটিত নিরুদ্যম -বশতই হউক, পৃথিবীর উপর হিন্দুদের লুব্ধমুষ্টি অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। জগতের কিছুর উপরে তেমন প্রাণপণ দাবি ছিল না। প্রবৃত্তির সেই উগ্রতা না থাকিলে মাংসপেশীতেও যথোচিত শক্তি জোগায় না। গাছ যেমন সহস্র শিকড় দিয়া মাটি কামড়াইয়া থাকে এবং চারি দিক হইতে রস শুষিয়া টানে, যাহারা তেমনি আগ্রহে জগৎকে খুব শক্ত করিয়া না ধরিতে পারে জগৎও তাহাদিগকে ধরিয়া রাখে না। তাহাদের গোড়া আলগা হয়, তাহারা ঝড়ে উল্টাইয়া পড়ে। আমরা হিন্দুরা বিশেষ করিয়া কিছু চাহি না, অন্যের প্রাচীরের সন্ধি বিদীর্ণ করিয়া দূরের দিকে শিকড় প্রসারণ করি না, সেইজন্য যাহারা চায় তাহাদের সহিত পারিয়া উঠা আমাদের কর্ম নহে।

যাহারা চায় তাহারা কেমন করিয়া চায় এই সমালোচ্য গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। পৃথিবীর জন্য এমন ভয়ংকর কাড়াকাড়ি, রক্তপাত, এত মহাপাতক একত্রে আর কোথাও দেখা যায় না। অথচ এই রক্ত-স্রোতের ভীষণ আবর্তের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে দয়া দাক্ষিণ্য ধর্মপরতা রত্নরাজির ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

য়ুরোপীয় খৃস্টান জাতির মধ্যেও এই বিশ্বগ্রাসী প্রবৃত্তিক্ষুধা কিরূপ সাংঘাতিক তাহা সমুদ্রতীরের বিলুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণ ও রক্তকায় জাতিরা জানে। রূপকথার রাক্ষস যেমন নাসিকা উদ্যত করিয়া আছে, আমিষের ঘ্রাণ পাইলেই গর্জন করিয়া উঠে 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ',

ইহারা তেমনি কোথাও এক-টুকরা নূতন জমির সন্ধান পাইলেই দলে দলে চীৎকার করিয়া উঠে, 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ মাটির গন্ধ পাঁউ'। উত্তর-আমেরিকার ক্লণ্ডাইক-নামক দুর্গম তুষারমরুর মধ্যে স্বর্ণখনির সংবাদ পাইয়া লোভোন্মত্ত নরনারীগণ দীপশিখালুব্ধ পতঙ্গের মতো কেমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে— পথের বাধা, প্রাণের ভয়, অন্নকষ্ট কিছুতেই তাহাদিগকে রোধ করিতে পারে নাই, সে বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে সকলেই পাঠ করিয়াছেন। এই-যে অচিন্তনীয় কষ্টসাধন— ইহাতে দেশের উন্নতি হইতে পারে; কিন্তু ইহার লক্ষ্য দেশের উন্নতি, জ্ঞানের অর্জন অথবা আর-কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নহে— ইহার উদ্দীপক দুর্দান্ত লোভ। দুর্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণ যেমন লোভের প্ররোচনায় উত্তরের গোগৃহে ছুটিয়াছিল, ইহারাও তেমনি ধরণীর স্বর্ণরস দোহন করিয়া লইবার জন্য মৃত্যুসংকুল উত্তরমেরুর দিকে ধাবিত হইয়াছে।

অধিক দিনের কথা নহে, ১৮৭১ খৃস্টাব্দে একটি ইংরাজ দাসদস্যু-ব্যবসায়ী-জাহাজে কিরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা The Wide World Magazine -নামক একটি নূতন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ফিজিদ্বীপে য়ুরোপীয় শস্যক্ষেত্রে মনুষ্য-পিছু তিন পাউণ্ড্ করিয়া মূল্য দেওয়া হইত। সেই লোভে এক দল দাসচোর যে কিরূপ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত দক্ষিণসামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জে মনুষ্য শিকার করিত এবং একদা ষাট-সত্তর জন বন্দীকে কিরূপ পিশাচের মতো হত্যা করিয়া সমুদ্রের হাঙর দিয়া খাওয়াইয়াছিল তাহার নিদারুণ বিবরণ পাঠ করিলে খৃস্টান মতের অনন্ত-নরক-দণ্ডে বিশ্বাস জন্মে।

যে-সকল জাতি বিশ্ববিজয়ী, যাহাদের অসন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, তাহাদের সভ্যতার নিম্নকক্ষে শৃঙ্খলবদ্ধ হিংস্রতা ও উচ্ছৃঙ্খল

লোভের যে-একটা পশুশালা গুপ্ত রহিয়াছে, মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাইলে কণ্টকিত হইতে হয়।

তখন আমাদের মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের উদয় হয় যে, যে বৈরাগ্য ভারতবর্ষীয় প্রকৃতিকে পরের অন্নে হস্তপ্রসারণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে, দুর্ভিক্ষের উপবাসের দিনেও যাহা তাহাকে শান্তভাবে মরিতে দেয়, তাহা স্বার্থরক্ষা আত্মরক্ষার পক্ষে উপযোগী নহে বটে, তথাপি যখন মুসলমানদের ইতিহাসে দেখি উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনার সম্মুখে, ক্ষমতা-লাভ স্বার্থসাধন সিংহাসনপ্রাপ্তির নিকটে, স্বাভাবিক স্নেহ দয়া ধর্ম সমস্তই তুচ্ছ হইয়া যায়— ভাই-ভাই পিতা-পুত্র স্বামী-স্ত্রী প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে বিদ্রোহ বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা রক্তপাত এবং অকথ্য অনৈসর্গিক নির্মমতার প্রাদুর্ভাব হয়— যখন খৃস্টান-ইতিহাসে দেখা যায় আমেরিকায় অস্ট্রেলিয়ায় মাটির লোভে অসহায় দেশবাসীদিগকে পশুদলের মতো উৎসাদিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, লোভান্ধ দাসব্যবসায়ীগণ মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে নাই— যখন দেখিতে পাই পৃথিবীটাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নিজের কবলে পুরিবার জন্য সর্বপ্রকার বাধা অমান্য করিতে মানুষ প্রস্তুত— ক্লাইভ হেস্টিংস তাহাদের নিকট মহাপুরুষ এবং সফলতালাভ রাজনীতির শেষ নীতি— তখন ভাবি শ্রেয়ের পথ কোন্ দিকে। যদিও জানি যে বল পশুত্বকে উত্তেজিত করে সেই বল সময়ক্রমে দেবত্বকে উদ্‌বোধিত করে, জানি যেখানে আসক্তি প্রবল সেইখানেই আসক্তিত্যাগ সুমহৎ, জানি বৈরাগ্যধর্মের ঔদাসীন্য যেমন প্রকৃতিকে দমন করে তেমনি মনুষ্যত্বে অসাড়তা আনে এবং ইহাও জানি অনুরাগধর্মের নিম্নস্তরে যেমন মোহান্ধকার তেমনি তাহার উচ্চশিখরে ধর্মের নির্মলতম জ্যোতি, জানি যে যেখানে মনুষ্যপ্রকৃতির বলশালিতা-বশত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংঘর্ষ প্রচণ্ড

সেইখানেই দেবগণের ভোগে বিশুদ্ধতম আধ্যাত্মিক অমৃত উন্মথিত হইয়া উঠে, তথাপি লোভহিংসার ভীষণ আন্দোলন এবং বিলাসলালসার নিয়ত চাঞ্চল্যের দৃষ্টান্ত দেখিলে ক্ষণকালের জন্য দ্বিধা উপস্থিত হয়, মনে সন্দেহ জাগে যে— পাপ-পুণ্যের ভালো-মন্দের এইরূপ উত্তুঙ্গ তরঙ্গিত অসাম্য শ্রেয়, না, অপাপের অমন্দের একটি নির্জীব সুবৃহৎ সমতল নিশ্চলতা শ্রেয়! শেষের দিকেই আমাদের অন্তরের আকর্ষণ— কারণ, বিরাট সংগ্রামের উপযোগী বল আমরা অন্তঃকরণের মধ্যে অনুভব করি না; ধর্ম এবং অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই সব-ক'টাকে একত্রে চালনা করিবার মতো উদ্যম আমাদের নাই; আমরা সর্বপ্রকার দুরন্ত চেষ্টাকে নিবৃত্ত করিয়া সম্পূর্ণ শান্তিলাভ করিবার প্রয়াসী। কিন্তু শাস্ত্রে যখন ভারতবর্ষকে দুর্গপ্রাচীরের মতো রক্ষা করিতে পারে না, পরজাতির সংঘাত যখন অনিবার্য, যখন লোভের নিকট হইতে স্বার্থরক্ষা এবং হিংসার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে আমরা বাধ্য, তখন মানবের মধ্যে যে দানবটা আছে সেটাকে সকালে সন্ধ্যায় আমিষ খাওয়াইয়া কিছু না হউক দ্বারের বাহিরেও প্রহরীর মতো বসাইয়া রাখা সংগত। তাহাতে আর কিছু না হউক, বলশালী লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

কিন্তু হায়, ভারতবর্ষে দেব-দানবের যুদ্ধে দানবগুলো একেবারেই গেছে— দেবতারাও যে খুব সজীব আছেন তাহা বোধ হয় না। অন্তত সর্বপ্রকার শঙ্কা ও দ্বন্দ্ব -শূন্য হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ-কাহিনী। শ্রীনিখিলনাথ রায়-প্রণীত

মুসলমানের রাজত্ব গিয়াছে অথচ কোথাও তাহার জন্য শূন্য স্থান নাই। ইংরাজ-রাজত্বের রেলের বাঁশি, স্টিমারের বাঁশি, কারখানার বাঁশি চারি

দিকে বাজিয়া উঠিয়াছে— চারি দিকে আপিস-ঘর, আদালত-ঘর, থানাঘর মাথা তুলিতেছে ; ইংরাজের নূতন চুনকাম-করা ফিট্‌ফাট ধব্‌ধবে প্রতাপ দেশ জুড়িয়া ভিত্তি গাড়িয়াছে— কোথাও বিচ্ছেদ নাই। তথাপি নিখিল-বাবুর 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এই নূতন কর্ম-কোলাহলময় মহিমা মরীচিকাবৎ নিঃশব্দে অন্তর্হিত, তাহার পাটের কলের সমস্ত বাঁশি নীরব, কেবল আমাদের চতুর্দিকে মুসলমানদের পরিত্যক্ত পুরীর প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া। নিঃশব্দ নহবতখানা, হস্তীহীন হস্তীশালা, প্রভুশূন্য রাজতক্ত, প্রজাশূন্য আমদরবার, নির্বাণদীপ বেগমমহল একটি পরম বিষাদময় বৈরাগ্যময় মহত্ত্বে বিরাজ করিতেছে। মুসলমান-রাজলক্ষ্মী যেন শতাধিক বৎসর পরে তাহার সেই অনাথপুরীর মধ্যে গোপনে প্রবেশ করিয়া একে একে তাহার পূর্বপরিচিত কীর্তিমালার ভগ্ন চিহ্নসকল অনুসরণ করিয়া সনিশ্বাসে দূরস্মৃতি-আলোচনায় নিরত হইয়াছে।

নিখিলবাবু তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধে সেকাল-একালের তুলনা বা ভালোমন্দ বিচারের অবতারণা করেন নাই। তিনি সেই প্রাচীন কালকে খণ্ড খণ্ড চিত্র-আকারে নিবদ্ধ করিয়া পাঠকদের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানি যেন নবাবী আমলের ভগ্নশেষের অ্যাল্‌বম। চিত্র-গুলি সেদিনকার অসীম ঐশ্বর্য এবং বিচিত্রব্যাপারসংকুল মহৎ প্রতাপের অবসানদশার জন্য একটি স্নিগ্ধ করুণা এবং গভীর বিষাদের উদ্রেক করিতেছে।

এপ্রকার ঐতিহাসিক চিত্র-গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। নিখিলবাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন জেলা-নিবাসী লেখকগণ তাঁহাদের স্থানীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক চিত্রাবলী সংকলন করিতে থাকেন তাহা হইলে বাংলাদেশের সহিত বঙ্গবাসীর যথার্থ সুদূরব্যাপী পরিচয়- সাধন হইতে

পারে। নিখিলবাবুর এই সদ্‌দৃষ্টান্ত, তাঁহার এই গবেষণা ও অধ্যবসায়ের জন্য, বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এই বৃহৎ গ্রন্থে কেবল একটি নিন্দার বিষয় উল্লেখ করিবার আছে। নিখিলবাবু যেখানে সরলভাবে ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার রচনা অব্যাহতভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু যেখানে তিনি অলংকার-প্রয়োগের প্রয়াস পাইয়াছেন সেখানে তাঁহার লেখার লাবণ্য বৃদ্ধি হয় নাই, পরন্তু তাহা ভারগ্রস্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস। শ্রীহেমলতা দেবী

বিধাতা স্ত্রীজাতিকে এত কোমল করিয়াছেন যে সেই কোমলতার অবশ্য-সহচর দুর্বলতার দ্বারা তাহারা অসহায় এবং পরাধীন। তথাপি তাহা যুগ যুগান্তর চলিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ ছেলেদের মানুষ করিবার জন্য এই কোমলতা অত্যাবশ্যক। মাকে কোমলকান্ত করিয়া বিধাতা বলিয়াছেন, বাল্যাবস্থায় মাধুর্যের আনন্দচ্ছটা এবং স্নেহের সুধাভিষেকে মানুষ পালনীয়। পীড়ন, শাসন, সংকীর্ণ নিয়মের লৌহশৃঙ্খল তখনকার উপযোগী নয়। খাওয়ানো পরানো -সম্বন্ধীয় 'মানুষ করা' চিরকালই এইভাবেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুলবিস্তার লাভ করিয়াছে। মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এখন 'মানুষ করা' ব্যাপারটা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এখন কেবল অন্নপান নহে, বিদ্যা -দানেরও প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু বিধাতার নিয়ম সমান আছে। বাল্যাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গেও আনন্দের স্বাভাবিক স্ফূর্তি এবং স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক। কিন্তু অবস্থাগতিকে পুরুষের হাতে বিদ্যাদানের ভার পড়িয়া জগতে বহুল দুঃখ

এবং অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। বালকের স্বাভাবিক মুগ্ধতার প্রতি পুরুষের ধৈর্য নাই, শিশুচরিত্রের মধ্যে পুরুষের সস্নেহ প্রবেশাধিকার নাই। আমাদের পাঠালয় এবং পাঠ্যনির্বাচনসমিতি তাহার নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত। এইজন্য মানুষের বাল্যজীবন নিদারুণ নিরানন্দের আকর হইয়া উঠিয়াছে। পুনরায় শিশু হইয়া জন্মিয়া বিদ্যালাভ করিতে হইবে এই ভয়ে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মত এই যে, মা মাসি দিদিরাই অন্নদান ও জ্ঞানশিক্ষার দ্বারা বিশেষ বয়স পর্যন্ত ছেলেদের সর্বতোভাবে পালন পোষণ করিবেন। তাহাই তাঁহাদের কর্তব্য। বেত্রবজ্র-ধর গুরুমহাশয় তাহাদের স্নেহস্বর্গের অধিকার হরণ করিয়া লইয়াছে। ছেলে যখন কাঁদিতে কাঁদিতে পাঠশালায় যায় মাকে কি কাঁদাইয়া যায় না? এই প্রকৃতিদ্রোহী অবস্থা কি চিরদিন জগতে থাকিবে?

সমালোচ্য বাল্যপাঠ্যগ্রন্থখানি শিক্ষিতমহিলার রচনা বলিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি শিশুদিগকে শিক্ষাদান তাঁহাদের শিক্ষালাভের একটি প্রধান সার্থকতা। অধুনা আমাদের দেশের অনেক স্ত্রীলোক উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের সেই শিক্ষা যদি তাঁহারা মাতৃভাষায় বিতরণ করেন তবে বঙ্গগৃহে লক্ষ্মীমূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সরস্বতীমূর্তি বিকশিত হইয়া উঠিবে।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী যে ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন স্কুলে-প্রচলিত সাধারণ ইতিহাসের অপেক্ষা দুই কারণে তাহা শ্রেষ্ঠ। প্রথমত তাহার ভাষা সরল, দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসের একটি চেহারা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকর্ত্রী প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের মতে ইতিহাসের নামাবলী ও ঘটনাবলী মুখস্থ করাইবার পূর্বে আর্য-ভারতবর্ষ, মুসলমান-ভারতবর্ষ এবং ইংরাজ-ভারতবর্ষের একটি পুঞ্জীভূত

সরস সম্পূর্ণ চিত্র ছেলেদের মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। তবেই তাহারা বুঝিতে পারিবে ঐতিহাসিক হিসাবে ভারতবর্ষ জিনিসটা কী। এমন-কি আমরা বলি, ভারতবর্ষের ভূগোল ইতিহাস এবং সমস্ত বিবরণ জড়াইয়া শুদ্ধমাত্র 'ভারতবর্ষ' নাম দিয়া একখানি বই প্রথমে ছেলেদের পড়িতে দেওয়া উচিত। পরে ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস পৃথক্ ভাবে ও তন্ন-তন্ন-রূপে শিক্ষা দিবার সময় আসিবে। আমরা বোধ করি, ইংরেজিতে এরূপ গ্রন্থের বিস্তৃত আদর্শ সার উইলিয়ম হণ্টারের 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার'। এই সুসম্পূর্ণ সুন্দর পুস্তকটিকে যদি কোনো শিক্ষিত মহিলা শিশুদের অথবা তাহাদের পিতামাতাদের উপযোগী করিয়া বাংলায় রচনা করেন তবে বিস্তর উপকার হয়।

কিন্তু টেক্‌স্‌টবুক্‌-কমিটির খাতিরে গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার বইখানিকে যে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতো করিয়া লিখিতে পারেন নাই তাহা বেশ বুঝা যায়। ইস্কুলে ছেলেদের যে-সকল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক শুষ্ক তথ্য মুখস্থ করিতে দেওয়া হয় লেখিকা তাহার সকলগুলি বর্জন করিতে সাহসী হন নাই। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, মোগল রাজত্বের পূর্বে তিন শত বৎসর -ব্যাপী কালরাত্রে ভারত-সিংহাসনে দাসবংশ হইতে লোদীবংশ পর্যন্ত পাঠান রাজন্যবর্গের যে রক্তবর্ণ উল্কাবৃষ্টি হইয়াছে তাহা আদ্যোপান্ত কাহারই বা মনে থাকে এবং মনে রাখিয়াই বা ফল কী? অন্তত, এ ইতিহাসে তাহার একটা মোটামুটি বর্ণনা থাকিলেই ভালো হইত। নীরস ইংরাজ-শাসন-কাল সম্বন্ধেও আমাদের এই মত।

ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে আর্য-ইতিবৃত্তের তারিখ সম্বন্ধে মৌনাবলম্বনই শ্রেয়। 'খৃস্টজন্মের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে আর্যগণ উত্তরপশ্চিম দিক দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন' 'ভারতবর্ষে আসিবার এক হাজার বৎসর

পরে তাঁহারা মিথিলা প্রদেশ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন' —এ-সমস্ত সম্পূর্ণ আনুমানিক কালনির্দেশ আমরা অসংগত জ্ঞান করি।

সিরাজদ্দৌলার রাজ্যশাসনকালে অন্ধকূপহত্যার বিবরণ লেখিকা অসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'সিরাজদ্দৌলা' পাঠ করিতেন তবে এ ঘটনাকে ইতিহাসে স্থান দিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইতেন।

ইতিহাসকথা

আমাদের দেশে লোকশিক্ষা দিবার যে-দুটি সহজ উপায় অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে তাহা যাত্রা এবং কথকতা। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, প্রকৃতির মধ্যে কোনো শিক্ষাকে বদ্ধমূল করিয়া দিবার পক্ষে এমন সুন্দর উপায় আর নাই।

আজকাল শিক্ষার বিষয় বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে—একমাত্র পুরাণ-কথার ভিতর দিয়া সকলপ্রকার উপদেশ চালানো যায় না। অথচ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত দলের মধ্যে ভেদ যদি যথাসম্ভব লোপ করিয়া দেওয়াই শ্রেয় হয়, তবে যাহারা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত তাহাদের মধ্যে এমন অনেক জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক যাহা লাভ করিবার উপায় তাহাদের নাই।

একবারে গোড়াগুড়ি ইস্কুলে পড়িয়া সেই-সকল জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করা দুরাশা। সাধারণ লোকের ভাগ্যে ইস্কুলে পড়ার সুযোগ তেমন করিয়া কখনোই ঘটিবে না। তা ছাড়া, ইস্কুলে-পড়া জ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট গভীরভাবে প্রবেশ করে না।

ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষেতের মধ্যে যে জ্ঞানের বৈষম্য সব-চেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করা যায়, তাহা ইতিহাসজ্ঞান। স্বদেশে ও বিদেশে মানুষ কী করিয়া বড়ো হইয়াছে, প্রবল হইয়াছে, দল বাঁধিয়াছে, যাহা শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছে তাহা কী করিয়া পাইয়াছে, পাইয়া কী করিয়া রক্ষা করিয়াছে, সাধারণ লোকের এ-সমস্ত ধারণা না থাকাতে তাহারা শিক্ষিত লোকের অনেক ভাবনা-চিন্তার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছে না এবং তাহাদের কাজ-কর্মে যোগ দিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে মানুষ কী করিয়াছে ও কী করিতে পারে, তাহা না জানা মানুষের পক্ষে শোচনীয় অজ্ঞতা।

কথা এবং যাত্রার সাহায্যে জনসাধারণকে ইস্কুলে না পড়াইয়াও ইতিহাস শেখানো যাইতে পারে। এমন-কি, সামান্য ইস্কুলে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব তার চেয়ে অনেক ভালো করিয়াই শেখানো যাইতে পারে।

আজকাল য়ুরোপে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক ইতিহাসশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইতিহাসকে কেবল জ্ঞানে নহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করিলে তবেই তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়— এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।

সেই কল্পনার সাহায্যে সরলভাবে জ্ঞানদানের প্রণালী, জ্ঞানের বিষয়কে হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায়, আমাদের দেশে অনেক দিন হইতেই চলিত আছে— য়ুরোপ আজ সেইরূপ সরস উপায়ের দিকে ঝোঁক দিয়াছে আর আমরাই কি আমাদের জ্ঞানপ্রচারের স্বাভাবিক পথগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কল্পনালোকবর্জিত ইস্কুল-শিক্ষার শরণ লইব ?

আমার প্রস্তাব এই যে, ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার আকারে, স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনার দ্বারা সজীব সরস করিয়া দেশের সর্বত্র প্রচার করিবার উপায় অবলম্বন করা হউক। আমরা আজকাল কেবল মাসিক কাগজে ও ছাপানো গ্রন্থে সাহিত্য-প্রচারের চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু যদি কোনো কথা বা যাত্রার দল ইতিহাস ও সাহিত্য দেশের সর্বত্র প্রচার করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন তবে প্রচুর সার্থকতা লাভ করিবেন। আজকালকার দিনে কেবলমাত্র পৌরাণিক যাত্রা ও কথা আমাদের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইতিহাস, এমন-কি, কাল্পনিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে লোকশিক্ষা বিধান করিতে হইবে।

যদি বিদ্যাসুন্দরের গল্প আমাদের দেশে যাত্রায় প্রচলিত হইতে পারে,

তবে পৃথ্বীরাজ, গুরু গোবিন্দ, শিবাজী, আকবর প্রভৃতির কথাই বা লোকের মনোরঞ্জন না করিবে কেন? এমন-কি, আনন্দমঠ রাজসিংহ প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসই বা সুগায়ক কথকের মুখে পরম উপাদেয় না হইবে কেন?

—

ভারতবর্ষের ইতিহাস -প্রসঙ্গে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী এই গ্রন্থে সংকলিত হইল। ইহার কোনো কোনো রচনা পূর্বে অন্য গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, কতকগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে, অধিকাংশই এযাবৎ কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই। এগুলির সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশের বিবরণ দেওয়া গেল—

১	ভারতবর্ষের ইতিহাস	বঙ্গদর্শন	ভাদ্র ১৩০৯
২	ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা	প্রবাসী	বৈশাখ ১৩১৯
৩	শিবাজী ও মারাঠা জাতি		
৪	শিবাজী ও গুরু গোবিন্দসিংহ	প্রবাসী	চৈত্র ১৩১৬
৫	ভারত-ইতিহাস-চর্চা	শান্তিনিকেতন	চৈত্র ১৩২৬

পরিশিষ্ট ১

৬	কাজের লোক কে	বালক	বৈশাখ ১২৯২
৭	বীর গুরু	বালক	শ্রাবণ ১২৯২
৮	শিখ-স্বাধীনতা	বালক	আশ্বিন ও কার্তিক ১২৯২
৯	ঝান্সীর রানী	ভারতী	অগ্রহায়ণ ১২৮৪

পরিশিষ্ট ২

১০	ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ	ভারতী	বৈশাখ ১৩০৫
১১	সিরাজদ্দৌলা : ১	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
১২	সিরাজদ্দৌলা : ২	ভারতী	শ্রাবণ ১৩০৫
১৩	ঐতিহাসিক চিত্র	ভারতী	ভাদ্র ১৩০৫

১৪	ঐতিহাসিক চিত্র : সূচনা	ঐতিহাসিক চিত্র	জানুয়ারি ১৮৯৯
১৫	গ্রন্থ-সমালোচনা :		
	ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত	ভারতী	শ্রাবণ ১৩০৫
	মুর্শিদাবাদ-কাহিনী	ভারতী	শ্রাবণ ১৩০৫
	ভারতবর্ষের ইতিহাস	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
১৬	ইতিহাসকথা	ভাণ্ডার	আষাঢ় ১৩১২

১ এই প্রবন্ধ 'গত [১৩০৯] জ্যৈষ্ঠমাসে মজুমদার লাইব্রেরির সংস্পৃষ্ট আলোচনা-সমিতিতে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক [রবীন্দ্রনাথ] কর্তৃক পঠিত' হয়। এই প্রবন্ধ অংশতঃ পরিমার্জিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষ' (১৩১২) পুস্তকে প্রথম সংকলিত হয়। পরে রবীন্দ্রনাথের 'গদ্যগ্রন্থাবলী'র দ্বাদশ ভাগ স্বদেশ (১৯০৮ : ১৩১৫) পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয় ; এই সময় রবীন্দ্রনাথ রচনাটির অনেক অংশ নূতন করিয়া বর্জন করেন। বর্তমান গ্রন্থের পাঠ স্বদেশ গ্রন্থের অনুযায়ী। পূর্বোল্লিখিত 'ভারতবর্ষ' রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, উহাতে রচনাটির পূর্ণতর পাঠ পাওয়া যাইবে।

২ এই রচনা 'চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষ্যে ওভার্টুন হলে, ৩রা চৈত্র [১৩১৮] তারিখে পঠিত' হয়। প্রবন্ধটি উপলক্ষ্য করিয়া তৎকালীন সাময়িকপত্রাদিতে নানা বাদপ্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। অপর পক্ষে, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার প্রবন্ধটি ইংরেজিতে অনুবাদ (My Interpretation of Indian History) করিয়া 'মডার্ন্ রিভিউ' পত্রে (অগস্ট্ ও সেপ্টেম্বর, ১৯১৩) প্রকাশপূর্বক রচনাটির প্রতি বৃহত্তর পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কবির জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রবন্ধটির সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—

'আমার মনে হইল যে, প্রাচীন ভারতের রহস্যপূর্ণ ইতিহাসের নানা রঙের বহিরাবরণের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহার ভিতরের কথাটি যাহা এতদিন সহস্র চেষ্টা করিয়াও আলোকাভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়া উঠিতেছিল না, এইবার তাহার সে চেষ্টা বাঞ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিবে তাহার অরুণোদয় দেখা দিয়াছে··· ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের এই-যে একটা সম্ভবমত পাকা রকমের গোড়াপত্তন হইল, ইহা বঙ্গ-সরস্বতীর ভক্ত সন্তানদিগের কত না আনন্দের বিষয়'।

ঐরূপ ভূমিকার পর, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রসঙ্গক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ আরও যাহা লেখেন তাহার প্রধান অংশ নিম্নে সংকলিত হইল—

'মহাদেবের আদিম পীঠস্থান দক্ষিণ অঞ্চলে কি উত্তর অঞ্চলে ?

'রবীন্দ্রনাথের লেখার আভাসে আমার এইরূপ মনে হয় যে, তাঁহার মতে মহাদেবের আদিম পীঠস্থান দক্ষিণ অঞ্চলে। তিনি যাহা আঁচিয়াছেন তাহা একেবারেই অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে, যেহেতু বাস্তবিকই রাক্ষসাদি ক্রূর জাতিদিগের মধ্যে বিষ্ণুর স্নিগ্ধমূর্তি উপাস্য দেবতার আদর্শ পদবীতে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত; দুর্দান্ত রাক্ষস জাতিদিগের মনোরাজ্যের সিংহাসন শিবের রুদ্রমূর্তিরই উপযুক্ত অধিষ্ঠান-মঞ্চ। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমরা দেখিতে পাই যে, এক দিকে যেমন রক্ষ, আর-এক দিকে তেমনি যক্ষ। প্রাচীন ভারতের দক্ষিণ অঞ্চল যেমন রক্ষদিগের দলবলের প্রধান সংগমস্থান (headquarter) ছিল— উত্তর অঞ্চল তেমনি যক্ষদিগের দলবলের প্রধান সংগমস্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর্যদিগের চক্ষে দক্ষিণের দ্রাবিড়াদি জাতিরা যেমন রাক্ষস-বানরাদি মূর্তি ধারণ করিয়াছিল, উত্তরের মোগলাদি জাতিরা তেমনি যক্ষ-কিন্নরাদি মূর্তি ধারণ করিয়াছিল— ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। বিকটাকার-বিষয়ে

দক্ষিণের রক্ষ এবং উত্তরের যক্ষের মধ্যে যেমন মিল আছে, কিম্ভূত-কিমাকার-বিষয়ে তেমনি দক্ষিণের বানর এবং উত্তরের কিন্নরের সঙ্গে মিল আছে।

'এখন কথা হইতেছে এই যে, যক্ষদিগের রাজধানীতে— কুবেরপুরীতে— মহাদেবের অধিষ্ঠানের কথা কাব্যপুরাণাদি শাস্ত্রে ভূয়োভূয় উল্লিখিত হইয়াছে। তা ছাড়া কৈলাসশিখর মহাদেবের প্রধান পীঠস্থান।

'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-পাঠে একটি বিষয়ে আমার চক্ষু ফুটিয়াছে; সে বিষয়টি এই যে, জনক রাজা যে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে তিনি ভারতে কৃষিকার্য-প্রবর্তনের প্রধান নেতা ছিলেন; আর, তাঁহার গুরু ছিলেন বিশ্বামিত্র। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই যে, হিমালয়-প্রদেশের কিরাত জাতিরা ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিত— তাহারা কৃষিকার্যের ধারই ধারিত না। কিরাত জাতি মোগল এবং তাতারদিগের সহোদর জাতি ইহা বলা বাহুল্য। এটাও দেখিতেছি যে, হিমালয়ের উপত্যকায় মহাদেব অর্জুনকে কিরাত-বেশে দেখা দিয়াছিলেন। মহাদেব কিরাতদিগের দলে মিশিয়া কিরাত হইয়াছিলেন। মহাদেব পশুহন্তাও বটেন, পশুপতিও বটেন। মহাদেব যে অংশে কিরাতদিগের ইষ্ট দেবতা ছিলেন সেই অংশে তিনি পশুহন্তা; আর, যে অংশে তিনি খাস মোগলদিগের ইষ্ট দেবতা ছিলেন সেই অংশে তিনি পশুপতি। পুরাকালের মোগল এবং তাতার জাতিরা জীবিকালাভের একমাত্র উপায় জানিত— পশুপালন, তা বৈ, কৃষিকার্যের ক অক্ষরও তাহারা জানিত না— ইহা সকলেরই জানা কথা। তবেই হইতেছে যে, মোগল এবং তাতার জাতিরা— সংক্ষেপে যক্ষেরা— একপ্রকার পশুপতির দল ছিল; স্থতরাং পশুপতি-মহাদেব বিশিষ্টরূপে তাহাদেরই দেবতা হওয়া

উচিত ; আর, পুরাণাদিকে যদি শাস্ত্র বলিয়া মানিতে হয়, তবে ছিলেনও তিনি তাই। যক্ষরাজ কুবেরের রূপ ছিল অনার্যোচিত ; আর, তিনি ধনপতি নামে বিখ্যাত। প্রাচীন ভারতে ধন শব্দে বিশিষ্টরূপে গো-মেষাদি পশুধনই বুঝাইত। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পশু-জীবী মোগল তাতার প্রভৃতি জাতিরাই প্রাচীন ভারতের আর্যদিগের ইতিহাসে যক্ষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। কি পশুহন্তা কিরাত জাতি, কি পশুপালক মোগল জাতি— উভয়েই কৃষিকার্য-বিষয়ে সমান অনভিজ্ঞ ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ধনুর্ভঙ্গের ব্যাপারটিকে কোন্‌প্রকার বিঘ্নভঙ্গ বলিব ? কিরাতদিগের পশুঘাতী ধনুর্ভঙ্গ বলিব ? না রাক্ষসদিগের বিষ-দাঁত-ভঙ্গ বলিব ? আমার বোধ হয়— প্রাচীনকালে ভারতের উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক যোগসেতু বর্তমান ছিল ; কেননা লঙ্কাপুরী প্রথমে কুবেরের ছিল, পরে তাহা রাবণ বলপূর্বক হস্তগত করিয়াছিল। রাবণ এবং কুবের যে একই পিতার পুত্রদ্বয় ইহা কাহারও অবিদিত নাই।'

—আলোচনা। প্রবাসী : ১৩১৯ আষাঢ়

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি লইয়া পুনরায় আলোচনা করেন, তাহা A Vision of India's History নামে বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি পত্রে (১৯২৩ এপ্রিল) ও পরে ঐ নামে পুস্তকাকারে (১৯৫১ নভেম্বর) প্রকাশিত হয়।

বাংলা প্রবন্ধটি পরিচয় পুস্তকে (১৯১৬ : ১৩২৩) প্রথম সংকলিত হয়, পরে সমাজ গ্রন্থের নূতন সংস্করণে (১৩৪৪) গৃহীত হয়।

৩ এই রচনা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্যতম প্রাক্তন অধ্যাপক

পরলোকগত শরৎকুমার রায়ের 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' গ্রন্থের (১৩১৫) ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪ এই রচনা শরৎকুমার রায়ের 'শিখগুরু ও শিখজাতি' গ্রন্থের (১৩১৭) ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধের শেষ অংশ ("যাহা হউক, মারাঠা ও শিখের··· তুলিতে পারে না।") প্রবাসী পত্রিকায় নাই, উক্ত ভূমিকায় অতিরিক্ত আছে। এই প্রবন্ধটিও যদুনাথ সরকার মহাশয় ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া মডার্‌ন্ রিভিউ পত্রে (১৯১১ এপ্রিল) The Rise and Fall of the Sikh Power নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৫ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকালে তথায় 'ভারতের প্রকৃত ইতিহাস'-অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থার কথা যে কালে কবি পর্যালোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় এই প্রবন্ধ রচিত। প্রবন্ধশেষে লিখিয়াছিলেন— 'বিশ্বভারতীতে কোনো ছাত্র যদি এই [মহাযান বৌদ্ধপুরাণ-সকলের] অনুশীলনে নিযুক্ত হইতে পারেন তবে আনন্দের বিষয় হইবে। এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য সিংহলের মহাস্থবির মহাশয় আছেন এবং বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত-অধ্যাপনার অধ্যক্ষতা করিতেছেন, অতএব এখানে এই কাজ আরম্ভ করার সুযোগ আছে।'

৬-৮ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ও রবীন্দ্রনাথের কার্যাধ্যক্ষতায় প্রকাশিত 'বালকদের পাঠ্য সচিত্র কাগজ' বালকে মুদ্রিত এই প্রবন্ধগুলি, তৎকাল-প্রচলিত শিখজাতির ইতিহাস -সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহের ভিত্তিতে রচিত। পরবর্তীকালে এই ইতিহাস সম্বন্ধে আরও তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই-সকল প্রবন্ধে তথ্যগত অসম্পূর্ণতার সম্ভাবনা কোথাও কিছু থাকিলেও ইহাদের অন্য বিশেষ একটি মূল্য আছে।

শিখ-ইতিহাসকাহিনী লইয়া পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ একাধিক কবিতা রচনা করিয়াছেন— এই প্রবন্ধগুলি তাহারই একরূপ খসড়া-লিপি বলা চলে। মানসী কাব্যের 'গুরুগোবিন্দ', 'নিষ্ফল উপহার' এবং কথা কাব্যে 'শেষ শিক্ষা', 'প্রার্থনাতীত দান', 'বন্দীবীর' প্রভৃতি স্মরণ করা যাইতে পারে। শিখগুরুগণ 'যে ধর্মের সংগীত, যে আনন্দ ও আশার গান গাহিলেন ·· কত নূতন নূতন গুরু জাগিয়া উঠিয়া শিখদিগকে মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করিতে লাগিলেন' সেই কাহিনী কিশোরচিত্তে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। সেই বিবেচনায় যেমন উক্ত বহুখ্যাত কবিতাগুলির তেমনি এই রচনাগুলিরও রক্ষণ ও প্রচার আবশ্যক।

'কাজের লোক কে' ছুটির পড়া (১৯০৯ : ১৩১৬) পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৯ রচনাটি ভ. (অর্থাৎ, ভানুসিংহ, রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম) স্বাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই ইহা তাঁহার রচনা বলিয়া স্বীকৃত হয় ; দ্রষ্টব্য— শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক সংকলিত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী', শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৪৬।

রচনাটি প্রকাশিত হইবার সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স কিঞ্চিদূর্ধ্ব ষোলো বৎসর ; প্রথম পরিশিষ্টের প্রবন্ধগুলির ন্যায় ইহাও তৎকাল-প্রচলিত ইতিহাস-গ্রন্থাদির ভিত্তিতে রচিত।

১০ ভারতী পত্রে 'প্রসঙ্গকথা' নামে প্রকাশিত। রচনাটি রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে শিক্ষা গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'প্রসঙ্গকথা ২' নামে মুদ্রিত হইয়াছে।

১১-১২ এই রচনা দুইটি নবম খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর 'আধুনিক সাহিত্য' অংশে মুদ্রিত হইয়াছে। ১২-সংখ্যক রচনা ভারতীতে 'প্রসঙ্গকথা'

নামে প্রকাশিত।

১৩ ভারতী পত্রে 'প্রসঙ্গকথা' নামে মুদ্রিত। ঐতিহাসিক চিত্র নামে রবীন্দ্র-রচনাবলীর নবম খণ্ডে 'আধুনিক সাহিত্য' অংশে প্রকাশিত।

১৪ ঐতিহাসিক চিত্রের প্রথম সংখ্যায় 'সূচনা' নামে প্রকাশিত। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় -কর্তৃক সম্পাদিত ও রাজশাহী হইতে প্রকাশিত এই ত্রৈমাসিক পত্র 'এক বৎসরের অধিক চলে নাই।'

১৫ প্রথম সমালোচনাটি 'আধুনিক সাহিত্য' পুস্তকে 'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' নামে মুদ্রিত আছে। ভারতী পত্রেও ঐ নামে প্রকাশিত।

১৬ এই প্রবন্ধ রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে শিক্ষা গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক রচনায় ইতিহাস-প্রসঙ্গ ও আলোচনা আছে— যেমন, 'আদিম আর্যনিবাস', রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, সমাজ গ্রন্থের পরিশিষ্ট ; 'গুটিকত গল্প' ৩ (দ্র 'ছুটির পড়া', অচলগড়ের রাজা) বালক, বৈশাখ ১২৯২। ১৩১২ বৈশাখ-সংখ্যা ভাণ্ডার পত্রে প্রকাশিত 'মনস্তত্ত্ব-মূলক ইতিহাস' সংকলন রবীন্দ্রনাথের রচনা হওয়াই সম্ভব ; দ্রষ্টব্য ঐ প্রবন্ধের পাদটীকা। সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'সাহিত্যের সামগ্রী' ও 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে, ধর্ম পুস্তকে প্রকাশিত 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধে, 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে 'যাত্রার পূর্বপত্র' নিবন্ধে অশোক ও তাঁহার রাজত্বকালের প্রসঙ্গ আছে ; 'শিক্ষা'র অন্তর্গত 'তপোবন' প্রবন্ধে বিক্রমাদিত্যের যুগ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ আছে।